বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাংলা মুখপত্র

বিশ্ব হিন্দু বার্তা

৫১তম বর্ষ ◆ অষ্টম সংখ্যা ◆ চৈত্র, ১৪৩২ [মার্চ, ২০২৬]

মূল্য : ১৫ টাকা

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্

ওঁ

ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

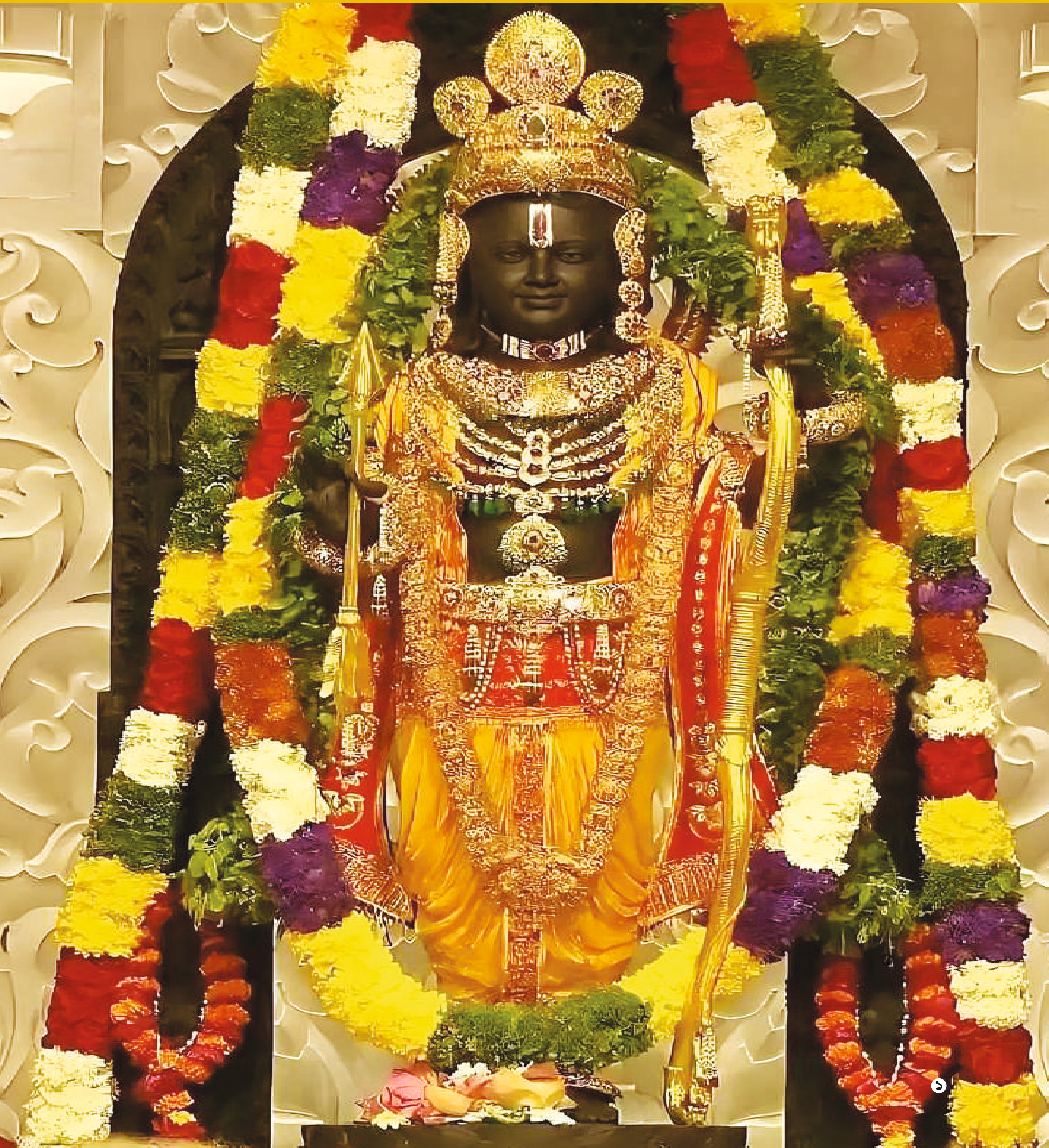

With best wishes from :

RGForex

Forex solutions for all your international travel needs, with doorstep delivery

- Currencies
- Prepaid Forex Cards
- Remittances
- Visas
- Passport

9475885843
9333411297
rgforexiitkgp@gmail.com

REMITX

বজরঙ্গ দলের সভা, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, বালিগঞ্জ, কলকাতা

বিশ্ব হিন্দু বার্তার বুক স্টল, তাম্রলিপ্ত জেলা, দক্ষিণবঙ্গ

বিশ্ব হিন্দু বার্তার বুক স্টল, গড়বেতা, দক্ষিণবঙ্গ

কল্যাণ বাণী

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্।। ১৮/২৪।।

'কিন্তু আবার নিজের জন্য ফল কামনা করে অথবা অহঙ্কারের সঙ্গে বহু কষ্টসাধ্য যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তা রাজসিক বলে পরিগণিত।'

সম্পাদকীয়...

"ওঁ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে, রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।"—এটি জপ করলে সুখ ও সমৃদ্ধি হয়। এছাড়াও, 'ওঁ শ্রী রামায় নমঃ' বা 'শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম' আমাদের জীবনে এই মন্ত্রগুলো পাথেয় হয়ে থাকবে। ২০২৬ সালের রামনবমী ২৬শে মার্চ, বৃহস্পতিবার পালিত হবে। রামনবমী তিথিটি চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবম দিনে পড়ে, যা ভগবান রামের জন্মবার্ষিকী হিসেবে পালিত হয়। পূজা ও উপবাসের জন্য সবচেয়ে শুভ সময় বা মধ্যাহ্ন মুহূর্ত হলো ২৬শে মার্চ সকাল ১১:১৩ থেকে দুপুর ০১:৪১ পর্যন্ত। রামনবমীকে সামনে রেখেই, আমাদের এই সংখ্যার বিশেষ ভাবনা রাখা হয়েছে। রাম নবমীর প্রাক্কালে আমাদের বাস্তব জীবনের কিছু ঘটনার কথা না বললেই নয়।

বাংলাদেশের প্রয়াত পূর্ব প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান ১৭ বছর নির্বাসনে থেকে, নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন। তখন বাংলাদেশে তাকে যে ধরনের স্বাগত জানানোর ভিড় জমায়েত হয়েছিল। তা দেখে নির্বাচনের ফলাফল কি হবে তা অনেকেই বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের ন্যাশনাল পার্টি অর্থাৎ বি.এন.পি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছে। এই নির্বাচনে জামাত-এ-ইসলাম এবং দশটি অন্যান্য পার্টির জোট বিফল হয়েছে। শুধু ওরা বিফল হয়েছে তা ঠিক নয়, ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার সমর্থিত চরমপন্থী ছাত্র আন্দোলনকারীদের ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি অর্থাৎ এন.সি.পি-কে বাংলাদেশের জনসাধারণ একেবারে প্রত্যাখ্যান করেছে। এছাড়া কার্যকরী সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনুসের বাড়া-ভাতে ছাই ফেলেছে ওই দেশের নাগরিকরা। ইউনুস ষড়যন্ত্র করেছিল যে, কোন দল যাতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়। তাহলে নিরপেক্ষতার আড়ালে সে আবার চেয়ার দখল করে বসবে। কিন্তু শেখ হাসিনার সমর্থকরা ইউনুসের এই ষড়যন্ত্রকে বুঝতে পেরে, বি.এন.পি-কে ভোট দিয়ে গণতন্ত্রকে স্থাপিত করেছে। ইউনুসের সঙ্গে সঙ্গে চীন এবং পাকিস্তানের মনোবাঞ্ছনা ধ্বংস হয়েছে। কারণ তারা ভেবেছিল জামাত বাংলাদেশের ক্ষমতায় এলে, সেখান থেকে তাদের ভারত বিরোধী কাজ চালানো সহজ হবে। যদিও এর আগে বি.এন.পি-কে ভারতের হিতৈষী ভাবা হতো না, কিন্তু তারেক রহমান বাংলাদেশে ফিরে এসেই ভারতের সঙ্গে স্থির সম্পর্ক বানানোর পক্ষে তার রায় দিয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর করার সংকেত হিসেবে বাংলাদেশের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন বার্তা দিয়ে, ভারতবর্ষে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রীর পরবর্তী পদক্ষেপকে নজর রাখা দরকার।

সম্প্রতি ইসরোর সব থেকে বিশ্বস্ত **PSLV-C62**-র ১৬টি কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশের প্রক্ষাপেনের জন্য যাত্রা করা শুরু করে। কিন্তু তৃতীয় চরণে তা নিজের নির্ধারিত পথ হারিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। ঠিক একই ভাবে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে **PSLV-C61** একই স্থানে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ দৃষ্টিতে এই দুই ঘটনাকে ইঞ্জিনিয়ারিং ফল্ট বলা হচ্ছে। কিন্তু সরকারের দৃষ্টিতে এবং বৈজ্ঞানিকদের মতে এর পেছনে ষড়যন্ত্রের হাত থাকতে পারে। সেই কারণে অজিত ডোভালকে এর প্রকৃত কারণ খুঁজে বার করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রের ভাবনাচিন্তা এই কারণে করা হচ্ছে যে, ভারতবর্ষ যেভাবে কম খরচে এবং সফলতার সঙ্গে তার মহাকাশ অভিযান করে চলেছে, তা অন্য অনেক দেশের মহাকাশের ব্যবসাকে বিঘ্নিত করে তুলেছে। বিশ্বের অনেক দেশ এখন ইসরোর মারফত তাদের কৃত্রিম উপগ্রহগুলোকে মহাকাশে পাঠাচ্ছে। ভারতবর্ষকে এই মহাকাশ ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বার করার জন্য এই ধরনের ষড়যন্ত্র করা হতে পারে। আশা করা যেতে পারে, বর্তমান সরকার এই ষড়যন্ত্রকে কঠোরভাবে মোকাবিলা করবে।

গণতান্ত্রিক দেশে প্রশ্ন তোলা এবং বিরোধ করার অধিকার সকলের আছে, কিন্তু নিয়ম ও আইন পালন করে। কিন্তু বিরোধিতা করতে গিয়ে কি বিশ্বের কাছে দেশের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করার অধিকার থাকে? অথচ কংগ্রেসের যুব সংগঠনের কিছু সদস্য খালি গায়ে দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত এ.আই নিয়ে আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনে ঢুকে পড়ে বিক্ষোভের নামে এই ধরনের কাজ করেছেন। এই নিয়ে যখন বি.জে.পি তো বটেই, বিরোধী **I.N.D.I** জোটের শরিক দলগুলোও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এমনকি কংগ্রেসের ভিতরের আপত্তির সুর বেজেছে। কিন্তু কংগ্রেসের প্রধান মুখ তথা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী সমাজ মাধ্যমে জানিয়েছে, তাঁরা পিছু হাঁটবেন না। এই সম্মেলনে দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভ নিয়ে তাঁর মধ্যে কোন অনুশোচনা নেই। যুব কংগ্রেসের সদস্যরা ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির বিরোধিতায় ওই বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিক্ষোভ দেখানোর আর অন্য কোন জায়গা কি ছিল না? কেন এর জন্য এ.আই শীর্ষ সম্মেলনকে বেছে নেওয়া হল? বাণিজ্য চুক্তির সঙ্গে এ.আই সম্মেলনের কোন রকম যোগসূত্র নেই। অথচ সেই সম্মেলনের সঙ্গে দেশের সম্মান জড়িত ছিল। ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৮৬টি দেশের প্রতিনিধি এবং ২০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা। তাদের সামনে, দেশকে ছোট না করলেই কি চলছিল না? বাস্তবে দেশের সম্মান রক্ষা করা প্রতিটি দল ও মানুষের কর্তব্য। সম্প্রতি ইজরাইলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময়ে সেই দেশের বিরোধী পক্ষ এই সু-আচরণ করে নিদর্শন স্থাপিত করেছেন। ইজরাইলের সরকার পক্ষ এবং বিরোধী দলগুলোর মধ্যে মত বিরোধ চলছিল। কিন্তু বিদেশের প্রধানমন্ত্রীর (ভারত) সম্মানে আয়োজিত সংসদ ভবনের অনুষ্ঠানে সকলে একসঙ্গে উপস্থিত থেকে সুষ্ঠু গণতন্ত্রের প্রমাণ দিয়েছেন তাঁরা। ভারতের বিরোধী দলগুলোকে ইজরাইলিদের আচরণ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

ভারতবর্ষের সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব ভারতের নির্বাচন কমিশনের হাতে ন্যস্ত। সময় সময় ভোটার তালিকা সংশোধন করার মাধ্যমে, মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া এবং নতুন যোগ্য নাগরিকদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। এছাড়া যারা ভারতবর্ষের নাগরিক না, কিংবা কোন ব্যক্তির একাধিক জায়গায় নাম নথিভুক্ত আছে কিনা, সেসব দেখার দায়িত্বও নির্বাচন কমিশনের। এই প্রক্রিয়াকেই ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা **Special Intensive Revision (S.I.R)** বলা হয়। এই প্রক্রিয়া দেশের মধ্যে প্রথম হচ্ছে তা নয়, এর আগে ৮ বার এই প্রক্রিয়া করা হয়েছে। ভোটার তালিকা যদি সঠিক না হয়, তাহলে ভুয়ো নাম, একাধিক জায়গায় নাম অথবা অযোগ্য ব্যক্তিরা ভোটার তালিকায় থেকে যাবে। যা গণতন্ত্রের পক্ষে সমান ক্ষতিকর। সুতরাং এই **S.I.R** স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার একটি প্রয়োজনীয় উপায়। শুধু শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই প্রক্রিয়াকে ভয়ংকর বলে চিহ্নিত করার কি প্রয়োজন আছে? যেখানে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে **S.I.R** স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। আবেদনের সুযোগ, সহায়তা কেন্দ্র এবং নথিপত্রের ১১টি বিকল্প ব্যবস্থা আছে, সেখানে ভয়ের কি কোন কারণ থাকতে পারে? এই তথ্য মেনে ভারতবর্ষে আর অন্য রাজ্যগুলোর ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কেন হবে না? বাস্তবে সকল পক্ষেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। সেই উদ্দেশ্যে **S.I.R** প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে, বরং এর গুণগত শৈলী পরিবর্ধনে সকলেরই সহায়ক হওয়া উচিত। গণতন্ত্রে সংশয় প্রকাশ করা যেমন নাগরিক অধিকার, তেমনই সেই প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আবার নির্বাচনের সময় ভোটের অধিকার প্রয়োগ করাও নাগরিক কর্তব্যের মধ্যে পরে। সাধারণত দেখা যায় ভোটদানের দিন অনেক মানুষ ভোট দিতেই যান না। বরং সেই দিনটিকে একটি ছুটির দিন ধরে আমোদ-প্রমোদ করে ব্যয় করেন। কিন্তু দেখা গেছে, বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষেরা যতটা সম্ভব বেশি করে ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। কারণ তাঁরা খুব ভালোভাবেই জানেন এই ভোট দানের অধিকার আবার পাঁচ বছর পরে আসবে। তাই তাঁরা তাদের পছন্দের সরকারকে অর্থাৎ যারা তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করবে তাদের ক্ষমতায় (রাজনৈতিক) স্থাপিত করে থাকেন। অন্যদিকে যাঁরা ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন না, তারাই আবার বলে থাকেন—এই ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন আসবে না। অথচ পরিবর্তনের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে তাদের মতামত দেন না ভোটের মাধ্যমে। আবার পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাঁরা ভোট দান করেন, তারাও পরোক্ষভাবে নোংরা রাজনীতির সমর্থন যোগান। দেশের বিচার ব্যবস্থা বারংবার প্রশ্ন তুলে থাকেন, ভাতা প্রদানের ফলে মানুষের কর্মের প্রতি অনীহা বেড়ে যাচ্ছে, উপরন্ত অর্থের অভাবে দেশের বিকাশ মুলক কাজও বিঘ্নিত হচ্ছে। সুতরাং ভাবার সময় এসেছে বলে আমরা মনে করি। সাময়িক লাভ কিংবা প্রলোভনে আকৃষ্ট না হয়ে, সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ভোট দান করা দরকার। এইসব কারণেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ তার শতবর্ষে পাঁচটি সংকল্পের সংরচনা করেছে। তার মধ্যে নাগরিক কর্তব্য একটি। আবার নাগরিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতার একটি অংশ হচ্ছে ১০০% ভোট দান। সুতরাং আমার সমাজের মধ্যে আমাদেরই সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ভোটের সময় ভোট দানের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্র এবং দিল্লিতে ভোট পার্সেন্ট বৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রবাদী সরকার গঠন হয়েছে। আশা করা যায় আগামী নির্বাচনগুলোতেও মানুষ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে তাদের মতদানের অধিকারকে প্রয়োগ করে, সঠিক ও সুষ্ঠু সরকার গঠন করবে। ■

আগামী দুই সংখ্যার বিষয়

বৈশাখ ১৪৩৩ (এপ্রিল, ২০২৬) : চড়ক পূজা, আম্বেদকর জয়ন্তী, বাংলা নববর্ষ, অক্ষয় তৃতীয়া, পরশুরাম জয়ন্তী, বুদ্ধ পূর্ণিমা, ছত্রপতি শিবাজী জয়ন্তী, সীতা নবমী, নৃসিংহ অবতার বিবিধ।

জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ (মে, ২০২৬) : রবীন্দ্র জয়ন্তী, শ্রীশঙ্করাচার্য জয়ন্তী, মহারানা প্রতাপ জয়ন্তী, বীর সভারকার জয়ন্তী, নারদ জয়ন্তী বিবিধ।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ
ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের
বাংলা মুখপত্র

বিশ্ব হিন্দু বার্তা

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্ ওঁ ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

কার্যালয় : ৩৩, ভূপেন বোস এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪

প্রচার কার্যালয় : ১৭বি, নলিন সরকার স্ট্রিট, খান্না মোড়, কলকাতা-৪

দূরভাষ : ২৫৫৫-৩৫৮৯, দিলীপকুমার ঝাঁওর : ৯৯৩৩১৫০০৩৭

pnb
SCAN & PAY USING ANY BHIM UPI APP
9038149815m@pnb
MERCHANT: VISHVA HINDU VARTA

৫১তম বর্ষ ❋ অষ্টম সংখ্যা ❋ চৈত্র, ১৪৩২ (মার্চ, ২০২৬)

‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’র পরিচালন মণ্ডলী

● সভাপতি
শ্রীদিলীপকুমার ঝাঁওর

● সহ-সভাপতি
শ্রীচন্দ্রনাথ দাস (সম্পাদক, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীতরুণকুমার লায়েক (সম্পাদক, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীলক্ষ্মণ বনসল (সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীশঙ্কর রায় (সম্পাদক, ত্রিপুরা প্রান্ত)

● সম্পাদক
অধ্যাপক ড. জয়ন্ত বিশ্বাস

● সহ-সম্পাদক
শ্রীসৌগত বসু, সুশ্রী পারমিতা পাল

● প্রচার প্রসার প্রমুখ
শ্রীজয়ন্ত ভৌমিক

● সহ-প্রচার প্রসার প্রমুখ
শ্রীচন্দন গুপ্তা (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীবিপ্লব চ্যাটার্জি (মধ্যবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীশ্রীকান্ত ঘোষ (উত্তরবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীঅমলকান্তি দাশ (ত্রিপুরা প্রান্ত)

● সদস্য : শ্রীপীতারুণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীপক চৌধুরী, শ্রীঅর্ণব দে, শ্রীশুভজিৎ দাস

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৩
মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র —ড. রামানুজ গোস্বামী স্মৃতিতীর্থ ৬
সনাতনী সংস্কৃতির সেতু : শ্রীরাম চরিত্র —দিলীপ কুমার ঝাঁওর ৮
শ্রীহনুমান : শ্রীরামভক্তির পরম পিপাসু —রাজকুমারী মাহেশ্বরী ১১
শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত : প্রকৃত জীবনের প্রতিফলন —রবিব্রত ঘোষ ১৪
এক ঐশ্বরিক জাগরণ : শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম রহস্যময় অভিজ্ঞতা—বরিষণ চট্টোপাধ্যায় ১৭
‘যত মত তত পথ’ হিন্দু ঐক্যের ভিত্তি—স্বামী মৃগানন্দ ১৮
মহাপ্রভু চৈতন্যদেব : মানব চেতনার অবতার —পারমিতা পাল ২৩
মহাশিবরাত্রি—আলপনা ঘোষাল ২৬
প্রকৃত জীবনশৈলী : ভগবান মহাবীরের উপদেশ —আদিত্য দেব ২৮
হিন্দু নববর্ষ : বর্ষ-প্রতিপদ—ড. জয়ন্ত বিশ্বাস ২৯
হিন্দু ধর্মের নিদর্শন : কম্বোডিয়া—ডাঃ মধুসূদন পাল ৩১
বার বার রাম নবমীর মিছিলে হামলা হয় কেন? —সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ৩৪
মৃত বাবরের পুনরুত্থান : বাংলাদেশি উদ্বাস্তুর স্বপ্নভগ্ন —ওমপ্রকাশ ঘোষ রায় ৩৬
২১বীং শতাব্দী কা রাজসূয় যজ্ঞ—অরুণ চূড়ীবাল ৪১

প্রতি সংখ্যার মূল্য	বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	দীর্ঘমেয়াদী গ্রাহক (১৫ বছর)	ডাক মাশুল
১৫ টাকা	১৮০ টাকা	২৫০০ টাকা	নিঃশুল্ক

বিশেষ ডাক ব্যবস্থায় ‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’র গ্রাহক শুল্ক বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বিশ্ব হিন্দু বার্তার গ্রাহক হওয়ার জন্য নিচের দেওয়া ব্যাঙ্ক তথ্যে শুল্ক পাঠান এবং নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর এই নম্বরে জানান : জয়ন্ত ভৌমিক : ৮৯৬১৭১২১০৬

VISHVA HINDU VARTA
Punjab National Bank A/c. No. : 1183010102690
IFSC Code : PUNB0118320, MICR : 700024325
Shyambazar Market Evening Branch

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

Back Cover Page	Rs. 50,000/-
Inside Front or Back Cover Page	Rs. 30,000/-
Inside Full Colour Page	Rs. 20,000/-
Colour Half Page	Rs. 10,000/-
Colour Quater Page	Rs. 5,000/-

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
E-mail : advertisement.vishvahinduvarta@gmail.com

চিঠিপত্র বিভাগ
পত্রিকার লেখা সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে এই নম্বরে হোয়াটঅ্যাপ করুন
৭৮৭২৪৬১৬১৬

প্রকাশন বিভাগ : বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ
মুদ্রণ : আদিত্য গ্রাফিক্স অ্যান্ড প্রিন্টিং
RNI No. : 30136/1976

● লেখকদের প্রতি

১। প্রতি ইংরেজি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠান।
২। পরিষদ সম্পর্কে বার্তা ছবি ও প্রতিবেদন **e-mail** কিংবা **WhatsApp**-এর মাধ্যমে পাঠাতে পারেন।
৩। প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখিত তথ্যের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে লেখক বা প্রাবন্ধিকের, কর্তৃপক্ষের নয়।

মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র

ড. রামানুজ গোস্বামী স্মৃতিতীর্থ

"ভয়হর মঙ্গল দশরথ রাম।
জয় জয় মঙ্গল সীতা রাম।।"

—'হে রাম, হে দশরখাত্মজ, তুমি ভয়হারী এবং মঙ্গলময়। মঙ্গলময় তোমার ও সীতার জয় হউক।'

মর্যাদা-পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হলেন সাক্ষাৎ ধর্ম স্বরূপ তথা ধর্মের সচল বিগ্রহ। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, যিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু, তিনিই ভূ-ভার হরণের নিমিত্ত, দুষ্টের দমন তথা অধর্মের বিনাশ করে ধর্মের সংস্থাপন এবং সাধু ভক্তদের রক্ষার্থে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ধন্য এই ভারতভূমি, ধন্য এই অযোধ্যাধাম, যেখানে ভগবান মানবরূপে অবতীর্ণ হয়ে নরলীলা সম্পাদন করেছেন। ভারতাত্মার দুই মূর্ত প্রতীক হলেন যথাক্রমে ত্রেতা যুগে আবির্ভূত ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং দ্বাপর যুগে আবির্ভূত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। দেবর্ষি নারদ শ্রীরামচন্দ্রকে বলেছেন 'নরচন্দ্রমাঃ'। রামায়ণ রচয়িতা মহর্ষি বাল্মীকিকে রামচরিত কথা শুনিয়েছিলেন দেবর্ষি নারদ। এরই পাশাপাশি স্বয়ং ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বলেছিলেন যে, "যতদিন ধরাতলে গিরি- নদী সকল বিরাজ করবে ততদিন রামায়ণ কথা সংসারে প্রচারিত থাকবে।" তারপর কত যুগ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। আজও রামায়ণ একইভাবে জনমানসে শ্রীরামের ভগবৎ সত্তা ও তাঁর মহিমার কথা প্রচার করে চলেছে। বস্তুতঃ রামায়ণ নিছকই পৃথিবীর প্রাচীনতম মহাকাব্য মাত্র নয়, ভারতের চিরন্তন ইতিহাসের মহান কাহিনীই রামায়ণের মধ্যে নিহিত আছে। যা কিছু ভারতের শাশ্বত সাধনা, চিরদিনের আদর্শ ও তপস্যা তার সবকিছুই রামায়ণ যুগে যুগে মানুষকে শিক্ষা দিয়ে চলেছে। রামায়ণ তাই ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আর পরস্পরার মূর্ত প্রতীক।

কেমন ভাবে আদর্শ মানুষ হতে হয়, রামায়ণ তারই শিক্ষা দেয়। শ্রীরামচন্দ্র রূপে পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাব এবং তাঁর পার্থিবলীলা কাহিনিই রামায়ণের মুখ্য উপজীব্য বিষয়। রামায়ণ তাই রামের মহিমা কীর্তন তথা আখ্যান এবং রামচরিতও বটে। রাম একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব। তাঁর মধ্যে কোন ত্রুটি পাওয়া যায় না। তিনি সর্বাঙ্গসুন্দর। সর্ব অর্থেই তিনি পুরুষোত্তম। তিনি 'জিতেন্দ্রিয়, সংযত-চিত্ত, ধৃতিমান, বুদ্ধিমান, মহাবীর্যবান। নীতিজ্ঞ ও শ্রীমান। গাম্ভীর্যে সমুদ্রের তুল্য, ধৈর্যে হিমালয় সদৃশ, ক্রোধে কালামি সম এবং ক্ষমায় পৃথিবীর মতো। তিনি ধর্ম ও জীবলোকের রক্ষক, সর্বশাস্ত্র মর্মদর্শী এবং ধর্ম ও সত্যের মানবীয় মূর্তি।' সত্য, ত্যাগ এবং তপস্যাই তাঁর আত্মা। স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বর রাম নাম জপ করেন। রাম নিজেই আনন্দস্বরূপ। তাই তিনি ভক্তদের আনন্দ প্রদান করেন। এই নাম চতুর্বর্গ ফল অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রদান করে থাকে। তুলসীদাসজীসহ ভারতের অগণিত মহাপুরুষ এই সারসত্য তাঁদের জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র হলেন শরণাগতবৎসল এবং আশ্রিত-জনের একমাত্র গতি। রামায়ণে রামকে সাধুগণের আশ্রয় ও রক্ষাকর্তা বলে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি অপ্রমেয় এবং স্বয়ং পরমাত্মা। তিনি নিজে কৃপা না করলে যোগীগণও তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হল না। রামায়ণে আমরা দেখতে পাই যে, শ্রীরামচন্দ্র হলেন পরম করুণাময়। তাই তিনি বহু প্রকার দোষ থাকা সত্ত্বেও আশ্রয়প্রার্থনাকারীদের সর্বদাই আশ্রয় দেন এবং তাদের সর্বতোভাবে রক্ষাও করে থাকেন। তাঁর শ্রীচরণের মহিমায় পাষাণী অহল্যা নবজীবন লাভ করেছিলেন। বহুজনের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে, রাবণের গুপ্তচরদের তিনি দন্ত না দিয়ে মুক্তি দিয়েছিলেন। রাবণের মতো ভয়াবহ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের প্রসঙ্গেও আমরা রামের ঐশ্বরিক মহত্বের প্রকাশ লক্ষ করে থাকি। যুদ্ধক্ষেত্রে রাম একাধিকবার পরাজিত, রণক্লান্ত এবং আহত রাবণকে রণভূমি পরিত্যাগ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বিশ্রামের জন্য সুযোগ দিয়েছিলেন। ওই অবস্থাতে রাম ইচ্ছা করলেই রাবণকে বধ করতে পারতেন। কিন্তু, রাম তা করেননি। এমনকি, যুদ্ধাবসানে রাবণ বধের পর, রাবণের শেষকৃত্য প্রসঙ্গে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণকে শ্রীরামচন্দ্র বলেছিলেন যে, "মৃত্যুতে সকল শত্রুতার অবসান হয়। এরপর আর রাবণকে ঘৃণা করা উচিত নয়। আমি যুদ্ধে জয়লাভ করেছি। কেন আমি তাঁর উপর আর বিদ্বেষ ভাব রাখব? তুমি আমার মিত্র। আমরা এক। সেজন্য

তোমার ভাই, আমারও ভাই। তোমার শেষ কর্তব্য করা উচিত। তুমি না করলে আমি নিশ্চয় করব।" স্বয়ং ভগবানের পক্ষেই, দুর্দান্ত শত্রুর প্রতিও এমন অপরিসীম মহত্ব প্রদর্শন করা সম্ভব।

লক্ষ্য করবার মতো বিষয় হল এই যে, শুধুমাত্র মনুষ্যজাতি নয়, এমনকি পশুপক্ষীরাও রামের কৃপালাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়নি। সকলের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন রামরাজ্য। রাম মর্যাদাসহকারে জটায়ু পক্ষীর অন্তিম সৎকার কার্য করেছেন এবং তাঁকে মোক্ষ প্রদান পর্যন্ত করেছেন। মহাপ্রস্থান কালে তিনি অযোধ্যার স্থাবর-জঙ্গম সকলকে, এমনকি তৃণকে পর্যন্ত মোক্ষ প্রদান করেছিলেন। এই কারণেই তিনি মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধর্মের স্থান চিরদিনই সবার থেকে উপরে। এই পৃথিবীতে বাস্তবিকই ধর্মক্ষেত্র বা ধর্মভূমি বলে যদি কোন ভূখণ্ডকে চিহ্নিত করতে হয়, তবে নিশ্চিত রূপেই তা হবে এই ভারতবর্ষ। এই ভারতে ধর্মকে চিরদিনই জীবন-যাপনের প্রধান ভিত্তি বলে গণ্য করা হয়েছে। গৃহস্থ থেকে তপস্বী, সম্রাট থেকে সন্ন্যাসী সকলের ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিকতার বেদীর উপরেই জীবনবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় জীবন-দর্শন অনুসারে পরম রূপবান, গুণবান, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, প্রস্তুত ধন-সম্পদের অধিকারী, উচ্চ ও সম্মানীয় কুলে জাত এবং অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী কোন ব্যক্তিও যদি অনৈতিকতা ও অধর্মের পথ অনুসরণ করে চলে, তবে সে অত্যন্ত নিন্দার পাত্র হয়ে থাকে এবং সমাজের সর্বত্রই ধিকৃত হয়ে থাকে। রাবণের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল। রামায়ণে রাবণ অধর্মের প্রতীক। রাবণের বিপরীতে রাম হলেন মূর্তিমান ধর্ম। রামের জীবনবেদ ধর্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তিনি একইসঙ্গে শাস্ত্রের আধার এবং আধেয় উভয়ই হয়েছেন। বেদাদি শাস্ত্রে যে পরমপুরুষের মহিমা বন্দিত হয়েছে, যে পরমেশ্বরের জয়গান সনাতন হিন্দু ধর্মে অনন্তকাল ধরে হয়ে চলেছে, স্বয়ং তিনিই রাম অবতারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হযেছিলেন। তাই রামের মহিমা যেমন অনন্ত, রামকথাও তেমনই অনন্ত। এই কথা পঠন, শ্রবণ, মনন, কীর্তন, ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন হয়ে থাকে। রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণ দুইই হিন্দুর পক্ষে অবশ্যই করণীয় কর্তব্য।

শ্রীরামচন্দ্রের মহিমার আখ্যান তথা রামায়ণ-কথা মানুষকে শক্তি প্রদান করে থাকে। নিঃসন্দেহে এই শক্তি হল আধ্যাত্মিক শক্তি, যা জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয় প্রকার উন্নতি লাভেই সহায়ক। জীবনের বিভিন্ন রকম পরিস্থিতিতে সর্বদাই কিভাবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে পথ চলতে হয়, রামায়ণ তারই চিরন্তন প্রতিফলন। এই কারণেই বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও, আজও রামায়ণের প্রাসঙ্গিকতা ক্রমবর্ধমান। এই কারণেই মানুষ রামায়ণ পাঠ করে আনন্দ, তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করে। বস্তুতঃ লোকশিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনেই মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রাম ভাই নিছকই একজন অবতার-পুরুষ বা ব্যক্তিত্বের নামমাত্র নয়। রাম অর্থে একটা আদর্শ, একটা গঠনমূলক ভাবনা এবং জীবন-যাপনের উচ্চতম তত্ত্বকে বোঝায়। রাম হল একটি বিচারধারার অপর নাম যা সমাজ থেকে সব রকম অপবিত্রতা এবং মলিনতাকে দূর করে সমাজকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকথা তাই মানুষকে ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের অভিমুখে, অন্ধকার থেকে আলোর অভিমুখে, মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে যাত্রা করবার অনুপ্রেরণা জোগায় তথা শক্তি প্রদান করে থাকে। বর্তমান যুগে সারা পৃথিবী জুড়ে নানা রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। সনাতন হিন্দু ধর্মে মুনি ঋষিরা সুপ্রাচীনকালেই বিভিন্ন রকম সমস্যার কথা ভেবে সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণার্থে শাস্ত্র গ্রন্থগুলো রচনা করেছিলেন। এই সকল শাস্ত্র গ্রন্থে বর্তমান কালের সমস্যাগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ সমাধান পাওয়া যায়। রামায়ণও এগুলির মধ্যে অন্যতম। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষাতেই নয়, বহু প্রাদেশিক ভাষাতেও রামায়ণ লেখা হয়েছে। তাছাড়া বহির্ভারতের বিভিন্ন ভাষাতেও রামায়ণ প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

হিন্দুবিদ্বেষীরা চিরদিনই নানাভাবে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বিরোধিতা করে বিভিন্ন রকম কটূক্তি করে থাকে। হিন্দুদের এই সকল বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক। বাল্যকাল থেকেই পরিবারের বালক-বালিকা, শিশু-কিশোরদের ধর্মনিষ্ঠ করে তুলতে হবে। প্রতিটি হিন্দু গৃহে রামায়ণ অবশ্য পাঠ্য হওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে যে অধর্ম, অসত্য এবং অনৈতিকতাকে নাশ করবার অস্ত্রই হল রাম নাম এবং রামকথা। তাই ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা সর্বত্রই হওয়া দরকার; কারণ রামের উপাসনার অর্থই হল ধর্মীয় চেতনার আলোকে এক ঐক্যবদ্ধ হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম এই মহান সংকীর্তন ধ্বনিতে প্লাবিত হোক আসমুদ্র হিমাচল তথা সমস্ত বিশ্ব। হিন্দু ধর্ম সর্বত্র সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হোক। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সকলের কল্যাণ করুন, এটাই কাম্য। ■

সনাতনী সংস্কৃতির সেতু : শ্রীরাম চরিত্র

দিলীপ কুমার ঝাঁওর

ভারতীয় সংবিধানে শ্রীরামচন্দ্রের ছবি অঙ্কিত করা হয়েছে, এর কারণ আমাদের সকলেই জানা, যে শ্রীরামচন্দ্র হলেন ভারতীয় সংস্কৃতির সেতু। এই সেতুর মানদণ্ড হচ্ছে মর্যাদা, আধার হচ্ছে আস্থা, পরাক্রম হচ্ছে পর্যায়, ধর্ম হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু। যাঁর জীবনে পরিবারের পাবন প্রথা আছে, মাতা সীতার অনুরক্তি আছে, অহিল্লার শক্তি, কেবটের কথা আছে, জটায়ুর ব্যথা আছে, শবরীর ভক্তি আছে, এই ধরনের ভগবান রামকে কেবলমাত্র ভক্তি সহকারেই বোঝা যায়। কিন্তু যাঁদের মনে মলিনতা আছে, যাদের মনরূপী দর্পণে অজ্ঞানতা ও অবিশ্বাসের ধুলো আচ্ছাদিত, তারা ভগবান রামচন্দ্রের ওই রূপকে দেখতেই পান না। এইজন্য কবি বলেছেন—

মুকুর মলিন অরু নয়ন বিহীনা।
রাম রূপ দেখই, কিমি দীনা।।

শ্রীরামচন্দ্রের জীবনী এমন এক পাঠশালা, যার অনেক নামে রচিত অধ্যায় রাম রাজ্যের লোকমান্যতা প্রাপ্ত হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র ভক্ত বৎসল, দীনদয়াল, করুণানিধান, তথা আরো অনেক কিছুর বিভূষণ যুক্ত। মানুষ নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে তাঁর যে কোন রূপকে ভালবাসতে ও ভক্তি করতে পারেন।

মহারাজ দশরথ ও মহারানী কৌশল্যা পূর্ব জন্মে সৃষ্টির আদি পুরুষ মনু ও স্ত্রী শতরূপা ছিলেন। বিশ্ববিমোহন পরমাত্মাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত করার জন্য নৈমিষারণ্য ২৩ হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু দর্শন দিয়ে বরদান চাইতে বললেন। বরদানে তারা চাইলেন,

চাহউঁ তুমহি সমান সুত।
প্রভু সন কবন দুরাউ।।

শ্রীবিষ্ণু এমন বলেন। তিনি বলেন আগামী জন্মে ভূলোকে রাজা দশরথ ও রানী কৌশল্যা রূপে তোমরা যখন পরিচিত হবে, তখন আমি পুত্ররূপে জন্ম নেব। মনু মহারাজ মোক্ষ কিংবা যশের কামনা না করে, বাৎসল্য-ভাবের আনন্দ পেতে চেয়েছেন, এই বরদান চেয়ে শ্রীরামচন্দ্র পরম পিতৃভক্ত ছিলেন। পিতার আদেশে ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে গিয়ে তারকা রাক্ষসীকে বধ করেন। তারপর গৌতম ঋষির শাপগ্রস্ত পত্নী অহীল্লাকে পাষাণের মতো জড়বত অবস্থা থেকে মুক্ত করেন এবং তাঁর সামাজিক মান্যতা ও মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করেন।

সীতার স্বয়ংবরে শিবধনুষ ভেঙে পরশুরামের অহংকারকে নষ্ট করে সীতাকে বিবাহ করেন। অযোধ্যার রাজ্যাভিষেকের প্রাক্কালে পিতার দেওয়া বচন পালন করার জন্য, সিংহাসনের মোহ ত্যাগ করে বনবাসকে মেনে নিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে অযোধ্যার রাজা হতে বললেন, কারণ তখন ভরত অনুপস্থিত। কিন্তু লক্ষ্মণ ভ্রাতৃপ্রেমে রাজমহল, পিতা-মাতা, স্ত্রী সমস্ত কিছু ত্যাগ করে বনবাসে শ্রীরামের সেবা করার পথ বেছে নিলেন। শ্রীরাম পত্নী সীতাকে বনবাসে নিয়ে যেতে চাননি, তাই তিনি সীতাকে বন-জঙ্গলে জীবন যাপনের কঠোর কষ্ট ও অসুবিধার ভীতি দেখালেন এবং কুটুম্বদের সঙ্গে রাজমহলে থাকবার প্রলোভন দেন। কিন্তু সীতা বলেন, 'পতির অনুপস্থিতিতে ভোগ—রোগের সমান, গহনা ভার স্বরূপ এবং সংসার নরকের পীড়ার সমান' তাই তিনি বনবাসকেই বেছে নিলেন।

অন্যদিকে ভরত অযোধ্যায় ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা জেনে দাদা শ্রীরামকে ফিরিয়ে আনতে বনে গেলেন। শ্রীরাম ফিরবেন না জেনে, তিনি শ্রীরামের পাদুকাকে রাজ সিংহাসনে প্রতিস্থাপিত করে নিজে বনবাসীর মতোই থেকে রাজকার্য শুরু করলেন। শ্রীরাম বনে তপস্যা করতেন, আর ভরত নন্দীগ্রামে তপস্যারত হয়ে ভাই শত্রুঘ্ন দ্বারা রাজত্ব চালাতেন। সনাতনী সংস্কৃতিতে ভাইদের মধ্যে ত্যাগের প্রতিযোগিতা দেখা যায়, কিন্তু বিধর্মীদের মধ্যে রাজা হওয়ার জন্য ভাই ভাইকে হত্যা পর্যন্ত করেছে, তা আমরা ইতিহাসে দেখেছি।

শ্রীরামচন্দ্রের বন গমন কালে শৃঙবেরপুরের গঙ্গা তটে অবস্থিত বাল্য সখা নিষাদ রাজ রামচন্দ্রকে সেখানেই বসবাস করে ১৪ বছর বনবাস কাটাতে আগ্রহ করেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বনবাস কালে ঋষি, মুনি, সন্ত, মহাত্মা আদির সৎসঙ্গ এবং সান্নিধ্য চেয়েছিলেন। এছাড়া সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষ—কোল, কিরাত, নিষাদ, শবর, বানর আদি গিরিজনদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি গঙ্গা পার করার সিদ্ধান্ত নেন। গঙ্গা পারাপারের

জন্য কেবটের সাহায্য নিয়ে, শ্রীরাম আংটি দিয়ে পারাই দিতে চাইলেন, কিন্তু ভক্ত কেবট বললেন,

ফিরতি বার মোহি জো দেবা,
সো প্রসাদু ম্যে শির ধরি লেবা।

বাস্তবে কেবট সেবার কোন প্রতিদান চায়নি।

শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস প্রসঙ্গে একজন কবি লিখেছেন,

সুখ সে সন্ন্যাসী বন কর দিখলাও,
তুম জগত প্রবাসী বন কর দিখলাও,
ইয়হ দুনিয়া রাম মানকর পূজেগী,
পেহলে বনবাসী বনকর দিখলাও।

দণ্ডকারণ্যে ভক্তি, শ্রদ্ধা সম্পন্ন এক বৃদ্ধ ভিলনি শবরী বসবাস করতেন। ওঁনার গুরুদেব মতঙ্গ মুনি বলেছিলেন, 'একদিন পরমব্রহ্ম শ্রীরাম তোমাকে দর্শন দেবেন, তখন তোমার জীবন সফল হবে'। গুরুর আদেশকে শ্রদ্ধাপূর্বক বিশ্বাস করে শবরী শ্রীরামচন্দ্রের আগমনের প্রতীক্ষায় রত ছিলেন। যেদিন শ্রীরাম শবরীর আশ্রমে এলেন, সেই ক্ষণই তার জীবনের পরম ক্ষণ ছিল। শবরী শ্রীরামচন্দ্রকে শ্রদ্ধাপূর্বক কুল খাওয়ালেন, কিন্তু যাতে প্রভু টক ফল না খেয়ে নেন, তাই তিনি চেখে চেখে ফল দিলেন। শ্রীরাম অত্যন্ত ভক্তি ভরে সেই এঁটো ফল পরম আনন্দে গ্রহণ করলেন। এটাই তো ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা। শবরী শ্রীরামকে পম্পা সরোবরের দিকে যাবার জন্য বললেন। তারপর যোগাগ্নি দ্বারা শরীর ত্যাগ করে স্বর্গের পথে চলে গেলেন।

প্রজাপতি কশ্যপজির পত্নী বিনীতার দুইটি পুত্র হয়, অরুণ এবং গরুড়। গরুড় ভগবান শ্রী বিষ্ণুর সারথী হন এবং অরুণ সূর্যের সারথি হন। অরুণের দুই পুত্র হয়, সম্পাতি ও জটায়ু। বালক অবস্থায় সম্পাতি ও জটায়ুর মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় সূর্যকে ছোঁয়ার জন্য। অসহ্য তেজ সহ্য করতে না পেরে জটায়ু মাঝ পথে ফিরে এলেন, কিন্তু সম্পাতি আরও উড়তে গিয়ে সূর্যের তাপে পাখাগুলোকে হারিয়ে দেন এবং সমুদ্রের কাছে পড়ে যান। এরপর জটায়ু পঞ্চবটিতে বসবাস করতে লাগলেন। একসময় রাজা দশরথের সঙ্গে জটায়ুর বন্ধুত্ব হয়। বনবাস কালে শ্রীরাম চন্দ্রের সঙ্গে জটায়ুর পরিচয় হয়। রাবণ যখন মাতা সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কার পথে বিমানে যাচ্ছিল, তখন সীতার ক্রন্দন শুনে জটায়ু রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন এবং আহত হলেন। শ্রীরাম সীতার খোঁজ করতে করতে মরোণাপন্ন জটায়ুকে দেখলেন। তখন তিনি জটায়ুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কেন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন? আপনি তো জানতেন হার নিশ্চিত'। তখন জটায়ু বললেন, 'হার-জিত যুদ্ধের নিয়ম, কিন্তু অন্যায়কে দেখেও মুখ ফিরিয়ে থাকা ক্লিবতার লক্ষণ। তাই যুদ্ধ করা আমার ধর্ম ছিল' (বর্তমান সমাজে সকলেরই এই মনোভাব থাকা উচিত)। রাম তখন মৃত জটায়ুর অন্তিম ক্রিয়া সম্পন্ন করে পম্পাপুরের পথে অগ্রসর হলেন।

পম্পাপুরে গিয়ে হনুমানজির মাধ্যমে বানর রাজ সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল শ্রীরামচন্দ্রের। অত্যাচারী বালিকে বধ করে, তার পুত্র অঙ্গদকে যুবরাজ বানালেন এবং সুগ্রীবকে কিস্কিন্ধার রাজত্ব প্রদান করলেন। হনুমানজি সমুদ্র পার করে অশোক বাটিকায় মাতা সীতার সন্ধান নিয়ে ফিরে এলেন। শ্রীরাম তখন বানর ও ভালু জনজাতির সাহায্য নিয়ে সেনাবাহিনী তৈরি করে, সাগর তীরে উপস্থিত হলেন। সাগর পার করবার জন্য বিভীষণের পরামর্শে তিন দিন ধরে প্রার্থনা করলেন, কিন্তু সমুদ্র তাঁর অনুনয়-বিনয়ে সাড়া না দিলে শ্রীরাম তখন তাঁর কোপ অর্থাৎ রাগ প্রদর্শন করে বললেন,

লছমন বান সরাসর আনু
সৌষে বারিধি বিসিঘ কৃষানু
সঠ সন বিনয় কুটিল সন প্রীতি
সহজ কৃপণ সন সুন্দর নীতি।।

শ্রীরাম ধনুকে বান চড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের মনে ভয়ের সঞ্চার হল। সে নিজের অহংকারকে ত্যাগ করে, প্রভু রামের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন,

ঝমহু নাথ সব অবগুন মেরে

সমুদ্র তখন নল ও নীলের যান্ত্রিক জ্ঞান সম্পর্কে বললেন, এবং সাগরের মধ্যে সেতুবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করলেন। তখন শ্রীরাম বলেছিলেন। ভয় বিন হোই না প্রীতি অর্থাৎ কখনো কখনো দুষ্টজনদের ভয় দেখালেই তাদের মধ্যে প্রীতি (বশ্যতা) উৎপন্ন হয়। (বর্তমান ভারতে এখন এই নীতিই গ্রহণ করা হয়েছে)

শ্রীরামচন্দ্র রাবণের ভাই বিভীষণকে লঙ্কার রাজত্ব দেবেন বলে অগ্র অঙ্গীকার করলেন এবং বাস্তবে রাবণের বংশ ধ্বংস করার পর লঙ্কার রাজত্ব বিভীষণকেই দিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও ভাই লক্ষ্মণ চেয়েছিলেন, স্বর্ণলঙ্কার রাজত্ব শ্রীরামেরই গ্রহণ করা উচিত। তখন শ্রীরাম বলেছেন, জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও গরিমাময়, তাই তিনি অযোধ্যায় ফিরে যাবেন। শ্রীরাম কিস্কিন্ধা এবং লঙ্কার রাজত্বের লোভ

করেননি। তার যুদ্ধে বিস্তারবাদী নীতির কোন স্থান ছিল না। তিনি যে কাজই করেছিলেন, তা ছিল ধর্মকে স্থাপনা করার জন্য।

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দশটি অবতারের মধ্যে দুইটি অবতার মুখ্য এবং পূর্ণ। প্রথম হচ্ছে শ্রীরাম এবং দ্বিতীয় হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ অবতার। এই দুই অবতারের চরিত্রের অন্তর আছে, যা বোঝা খুবই দুষ্কর, যে কোন চরিত্রকে অনুসরণ করা উচিত। শ্রীরাম এক স্ত্রীকে প্রেম করেছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অনেক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম অনন্ত ছিল। তাই মহাত্মারা বলে থাকেন শ্রীকৃষ্ণের বাণী এবং শ্রীরামচন্দ্রের ব্যক্তিগত চরিত্রকে সকলের আদর্শ স্বরূপ নেওয়া উচিত। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে কেন?

উত্তর হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিগত চরিত্র রহস্যময়, যা বোঝা ঋষি মুনিদের দ্বারা সম্ভব, কিন্তু রামচন্দ্রের চরিত্র খুবই সরল এবং গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা অনুসরণ করা উচিত, কারণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের কোন পাড় নেই। শ্রীরামচন্দ্রের সময়কালে অনাচারের মাত্রা কম ছিল, তাই তিনি বিভিন্ন প্রান্তে ও দেশে গিয়ে দুষ্টুদের নিধন করেছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সময় রাজারা অত্যন্ত অত্যাচারী এবং অনাচারী হয়ে গিয়েছিলেন। সাধারণ প্রজাদের জীবন কষ্টময় হয়ে উঠেছিল এবং ধর্মের নাশ হচ্ছিল। এই কারণে সবাইকে এক জায়গায় একত্রিত করে (কুরুক্ষেত্রে) সবার অন্ত করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। মহাভারতে দুর্যোধন কেবলমাত্র ধন-সম্পদের দ্বারা লোভগ্রস্ত হয়ে ন্যায়-অন্যায়কে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের অবতার নিয়ে সংসারকে লোভ মুক্ত করে ধর্মের পথে পরিচালিত করেন শ্রীবিষ্ণু।

ঠিক একইভাবে স্বর্গমৃগ মারীচির প্রভাবে সীতার মনে লোভ সঞ্চার হলে, শ্রীরাম তার পিছনে ছুটে ছিলেন, ফলে সীতা হরণ ও সমস্ত দুঃখের সম্মুখীন হন। অর্থাৎ স্বর্ণ, ধন-সম্পত্তির পিছনে চোখ বন্ধ করে ছুটবার পরিণাম শ্রীরাম দেখেছিলেন। ধর্মের মার্গ ত্যাগ করে কেবলমাত্র ধন সংগ্রহের লিপ্সা মানুষকে পতনের পথে নিয়ে যায়, তার প্রমাণ দুই অবতারই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও। এই জন্য শ্রীরাম নিজের জীবন চরিত্র দ্বারা আচরণ করে মানব জাতিকে ধর্মের পথ কি তা বুঝিয়েছেন। ওঁনার চরিত্র আদর্শ চরিত্র।

তাই আমাদের শ্রীরামের চন্দ্রের চরিত্রকে অনুসরণ করা দরকার এবং শ্রীকৃষ্ণের বাণীকে জীবনে স্থাপিত করা দরকার। ■

সৎসঙ্গ, শ্যামনগর, দক্ষিণবঙ্গ

বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরের বাৎসরিক অনুষ্ঠান, ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণবঙ্গ

শ্রীহনুমান : শ্রীরামভক্তির পরম পিপাসু

রাজকুমারী মাহেশ্বরী

শ্রীরামচন্দ্রের পরমভক্ত পবনপুত্র শ্রীহনুমান তাঁর আধ্যাত্মিক পরিচয় দিতে গিয়ে নিজেই বলেছেন, 'দেহ বুদ্ধির দ্বারা আমি আমার আরাধ্য শ্রীরামের দাস, জীববুদ্ধির দ্বারা আমি আমার অংশীর (মহাদেব) অংশ এবং আত্মার অভেদে আমি তাই যা আমার ইষ্টদেব স্বয়ং আছেন।' এইরূপ পরিচয়ের অর্থ, সাগরের সমান গভীরে বিরাজমান। এর বিশ্লেষণ কোন সাধারণ মানুষ দ্বারা করা সম্ভব নয়। শ্রীহনুমান দাস্য ভক্তির পরমপিপাসু এবং স্বধর্মাচরণ এবং প্রভুর প্রতি আত্মসমর্পণই তাঁর সাধনা। শ্রীহনুমানের ভক্তি, ভুক্তি ও মুক্তির উপর স্বান্তঃ সুকায়ঃ। ওঁনার ভীতর- বাহির সর্বত্রই আরাধ্যই আরাধ্য। ওঁনার শরীরের প্রতিটি কণায় রামচন্দ্রের অনুরাগ দ্বারা রঞ্জিত। আত্ম বিস্মরণই ওঁনার সমর্পণের চরম উপলব্ধি। হনুমানজি নিজের ইষ্ট দেবের কাছ থেকে কেবলমাত্র নির্ভরা ভক্তিই চান। বাস্তবে নির্ভরা ভক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে, একনিষ্ঠ ভগবত প্রাপ্তি। শ্রীহনুমান নিজের আরাধ্যের বিনীত দাস এবং আরাধ্য শ্রীরাম ওঁনার সর্ব সমর্থবান স্বামী।

রাবণকে বধ করে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এলে, ওঁনার রাজ্যাভিষেক করা হয়। তখন শ্রীরামচন্দ্র, আগত অতিথি এবং ভক্তদের কিছু না কিছু উপহার বন্টন করেন। মাতা সীতা, শ্রীহনুমানকে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং বহু মূল্যবান মোতির হার প্রদান করেন। শ্রীহনুমান তখন সেই হারের মোতিগুলো ভেঙে ফেলে দিলেন, তাঁর এই কাণ্ড দেখে সবাই হতবাক হয়ে গেলেন। মাতা প্রশ্ন করলেন তাঁর (হনুমানের) এই ধরনের আচরণের কারণ কি? উত্তরে হনুমানজি বলেছেন, যে বস্তুর মধ্যে রাম নেই সেই বস্তু তাঁর কোন কাজের না। তখন রাজসভায় উপস্থিত লোকেরা বলল, 'তাহলে তো তোমার দেহও তো কোন কাজের না, কারণ সেখানেও তো শ্রীরামচন্দ্র নেই।' উপস্থিত সকলের প্রশ্নের উত্তর শ্রীহনুমান তখন তাঁর বুক চিরে দেখিয়ে দিলেন, যে সেখানে শ্রীরামচন্দ্র ও মাতা সীতা বিরাজমান। অর্থাৎ তাঁর (হনুমানের) স্বামী বা প্রভু রামচন্দ্রের অতিরিক্ত কোন অনুরক্তি নেই।

শ্রীরামচন্দ্র ও ভাই লক্ষণ সীতা মাতার হরণের পর, ওঁনাকে খোঁজবার জন্য পম্পাপুরিতে পৌঁছালেন। তখন সুগ্রীব, বালির ভয়ে পাহাড়ে লুকিয়ে বসবাস করতেন। তিনি খবর পেলেন দুইজন যোদ্ধা পাহাড়ের পাদদেশে এসেছেন। সুগ্রীব ভাবলেন যে, তাকে ধরবার জন্য বালি লোক পাঠিয়েছে। সঠিক খোঁজ আনবার জন্য সুগ্রীব শ্রীহনুমানকে পাঠালেন। শ্রীহনুমান ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে শ্রীরাম ও লক্ষণের সঙ্গে কথাবার্তা বলেই বুঝতে পারলেন, তাঁর আরাধ্য দেব শ্রীরামচন্দ্রই মনুষ্য রূপে অবতরণ করেছেন। এমন ঘটনার উল্লেখ করে গোস্বামী তুলসীদাসজি বলেছেন—

'অখিল ভুবনপতি লিনহি মনুজ অবতারা।'

প্রথম সাক্ষাতের পরই শ্রীহনুমান প্রভু রামচন্দ্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জুড়ে গেলেন। বাস্তবিক ভক্ত সব সময়ই তাঁর আরাধ্যের শ্রীচরণে আর অন্য ভক্তজীব প্রাণীদের জুড়বার চেষ্টা করে থাকেন। জীব অর্থাৎ প্রাণী স্বয়ং দুর্বল, তাঁর মধ্যে স্বয়ং সাধনার দ্বারা প্রভুর দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছানোর শক্তি থাকে না। কিন্তু প্রভু যখন স্বয়ং ভক্তের ভক্তি দ্বারা দ্রবীভূত হন, তখন তিনি নিজেই তাঁর ভক্তকে শরণ দেন। বাস্তবে প্রভু নিষ্কাম, কিন্তু অসীম শক্তিমান। অন্যদিকে প্রাণী সকাম, কিন্তু শক্তিহীন। প্রভু জীবকে বুদ্ধি দেন সংসারকে বোঝার জন্য, আবার হনুমানজি প্রভুর সঙ্গে

জুড়বার মার্গ প্রদর্শন করেন। কিন্তু প্রাণী এই ক্রমকেই বদলে দেয়, সে সংসারে বিশ্বাস করে এবং ঈশ্বরকে বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে চায়। শ্রীহনুমান এই যোগসূত্রের কাজ করার জন্য শ্রীরামচন্দ্র ও সুগ্রীব মিলন ঘটান অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবের মিলন করান। দুইজনের মধ্যে দাস্য ভক্তির থেকেও সরল সখা-ভক্তির স্থাপনা করেন।

শ্রীহনুমানের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল মাতা সীতার খোঁজ করা। মাতা সীতা ছিলেন জ্ঞানী জনের শান্তি, ভক্তদের ভক্তি এবং কর্মযোগীদের শক্তি, তাই ওনার খোঁজ বস্তুত—শান্তি, ভক্তি এবং শক্তির খোঁজ। মাতা সীতার খোঁজ অভিযানের প্রথম চরণেই দেবতারা সর্পদের মাতা সুরষাকে পাঠালেন হনুমানজির বুদ্ধির পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। বাস্তবে সুরষার প্রসঙ্গ অহংকারের সঙ্গে বিনম্রতার লড়াই ছিল। সুরষা তাঁর মুখকে যেমন যেমন বিস্তার করতে লাগলেন, তেমনি তেমনি শ্রীহনুমান তাঁর দেহকে বিস্তার করলেন। কিন্তু অহংকার রূপী বিস্তারবাদকে হারানোর জন্য অতি লঘুরূপ ধারণ করে (বিনম্রতার প্রয়োগ) মুখের মধ্যে ঢুকে বাহির হয়ে অহংকারকে পরাভূত করেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লঙ্কার মধ্যে প্রবেশের সময় লঙ্কিনী নামের রাক্ষসীর সঙ্গে তাঁর বিবাদ হয়। শ্রীহনুমান প্রভুর কাজকে সুগম করার জন্য দুষ্ট রাক্ষসীর বধ করেন এবং তাকে মুক্তি প্রদান করেন। লঙ্কা নগরে প্রবেশ করার পর রাবণের ভাই বিভীষণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে মাতা সীতার বন্দী স্থানের খবর সংগ্রহ করেন এবং বিভীষণকে রামচন্দ্রের সঙ্গে মিত্রতা করার প্রেরণা দেন। অর্থাৎ শত্রুর ঘরে মিত্র খুঁজে শ্রীরামচন্দ্রের কাজ এগিয়ে রাখেন। অশোক বাটিকায় সীতা মাতাকে প্রভু রামচন্দ্রের মুদ্রিকা দেখিয়ে শোক নিবারণ করেন শ্রীহনুমান। তারপর অশোক বাটিকায় লণ্ডভণ্ড ঘটিয়ে স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে রাবণের রাজসভায় উপস্থিত হন তিনি। রাবণকে মাতা সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন, কিন্তু মূঢ় বুদ্ধি রাবণ হনুমানজির লেজে আগুন লাগাবার নির্দেশ দেন। আগুন লাগানোর পর তিনি লঘু আকৃতি ধারণ করে সমস্ত লঙ্কা নগরে আগুন লাগিয়ে দেন। এই অগ্নিকাণ্ডের দ্বারা লঙ্কার মানুষকে শ্রীরামচন্দ্রের আগমনের সূচনা যেমন দেন, তেমনি সমগ্র লঙ্কার আনাচে-কানাচে পরিদর্শন করে একটা নকশা মাথায় রেখে দেন। লেজের আগুন নিভিয়ে মাতা সীতার কাছে গিয়ে, তাঁর (মাতা সীতার) একটি চূড়ামণি নিয়ে সমুদ্র পার করে ফিরে এলেন। চূড়ামণি নেওয়ার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, প্রভু রামচন্দ্রের মনে বিশ্বাস জাগ্রত করা।

শ্রীহনুমান প্রভু রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হলে, জামবন্ত বললেন, সমস্ত দুর্গম কাজ হনুমানজির জন্যই সম্পন্ন হয়েছে। সবাই একসঙ্গে শ্রীহনুমানের প্রশংসা করতে লাগলে, হনুমানজি বলেন—'আত্ম প্রশংসা শুনলে অহংকার উৎপন্ন হয়, অহংকার থেকে হয় পতন।' সুতরাং প্রশংসা শুনে অহংকার না করে কাজের শ্রেয় ভাগ করে দেওয়া উচিত। তাই তুলসী দাসজি লেখেন, হনুমানজির বুলিতে—

'সো-সব তব প্রতাপ রঘুরাই।
নাথ ন কছু মোরি প্রভু তাই।।'

অর্থাৎ কর্তা তো প্রভুই এবং তিনিই তাঁর লীলা দেখানোর জন্য আমাকে নিমিত্ত বানিয়েছেন। আমি তো আপনারই, আমার মধ্যে বিদ্যমান পুরুষার্থও আপনার প্রদত্ত বরদান। কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ এবং লঙ্কা দহনের অন্তিম নিষ্পত্তি বা ফল সবকিছুই আপনার। এই ধরনের নিবেদন দ্বারা প্রভুর সঙ্গে নিজের অভীষ্ট প্রাপ্ত করাই হয়। তুলসীদাস আবার বলেছেন—

'নাথ ভগতি অতি সুখদায়িনী।
দেহু কৃপা করি অনপায়নী।।'

লঙ্কাতে যুদ্ধের সময় মেঘনাদ দ্বারা শক্তিবাণের আঘাতে লক্ষণ যখন চেতনা লুপ্ত হয়েছিলেন, তখন শ্রীহনুমান লঙ্কায় প্রবেশ করেন এবং সুষেন বৈদ্যকে তাঁর ঘর সমেত রণভূমিতে তুলে নিয়ে এসে নিজের বুদ্ধিমত্তা ও ভক্তির পরিচয় দেন শ্রীহনুমান। তারপর সুষেনের প্রয়োজন অনুসারে জড়িবুটি সন্ধানে গিয়ে সমগ্র গন্ধমাদন পর্বত কি তুলে এনে তাঁর শক্তি ও বুদ্ধির পরিচয় দেন শ্রীহনুমান। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন রাম-লক্ষণ নাগফাঁসে আবদ্ধ হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন, তখন তিনি গরুড় পক্ষীকে এনে রাম-লক্ষণকে বন্ধন মুক্ত করেন। যুদ্ধের সময় পাতাল লোকের স্বামী অহিরাবন শ্রীরাম ও লক্ষণকে তুলে নিয়ে যায়, তখন শ্রীহনুমান পাতালে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে অহিরাবন তাঁর আরাধ্যদেবীর পূজার জন্য পাঁচ দিশায় পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। তিনি জানতে পারেন যে ওই পাঁচটি প্রদীপ একসঙ্গে নিভিয়ে দিলে অহিরাবনকে বধ করা যাবে। সেই জন্য হনুমান পঞ্চমুখী রূপ ধারণ করলেন এবং উত্তর দিশাতে বরাহমুখ, দক্ষিণ দিশাতে

নরসিংহমুখ, পশ্চিম দিশাতে গরুড়মুখ, পূর্ব দিশাতে হনুমন্তমুখ ও আকাশের দিকে হয়গ্রীবমুখ। এই পঞ্চমুখী হনুমানজি একসঙ্গে পাঁচটি প্রদীপকে নিভিয়ে অহিরাবনকে বধ করেন এবং শ্রীরাম ও লক্ষণকে মুক্ত করেন। তারপর দুই ভাইকে কাঁধের উপর চড়িয়ে নিয়ে আসেন। রামায়ণে কথিত আছে, লক্ষণ ছিলেন শেষনাগের অবতার, যিনি পৃথিবীর সমস্ত ভার বহন করে থাকেন। রামচন্দ্রের আশীর্বাদ ধন্য শ্রীহনুমান সেই শেষনাগ এবং ত্রিভুবন পতি রামচন্দ্রকে বহন করে ভক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।

একবার শ্রীরামচন্দ্র ও মাতা সীতা এক সুশোভিত বৃক্ষের ছায়ায় বসেছিলেন, যেখানে লতা গাছের ফুলে সেই বৃক্ষের শোভা বৃদ্ধি করছিল। তখন রামচন্দ্র হনুমানজিকে বললেন পুষ্পিত লতার জন্য বৃক্ষের শোভা বৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু মাতা সীতা বললেন না, লতা তো বৃক্ষের আশ্রয় আছে বলেই সুরক্ষিত এবং স্নিগ্ধ আশ্রয় পাওয়ার জন্যই সে পুষ্প সুশোভিত হয়েছে। তখন হনুমানজি বলেন আপনারা দুজনেই ঠিক বলেছেন, কারণ রাম রূপী জ্ঞান এবং ভক্তিরূপী সীতার আশ্রয়েই ভক্ত যেমন স্নিগ্ধতা অনুভব করে, সেই রকমই সৃষ্টির সন্তুলনই শোভার কারণ। বাস্তবে ভক্তি তখনই নিরাপদে থাকে, যখন বৈরাগ্য (লক্ষণ ও হনুমান) শ্রীরাম ও মাতা সীতা দুজনেরই স্নিগ্ধ ছায়ায় থাকে। শ্রীরাম ও ভক্ত হনুমানের সম্পর্ক নিয়ে একটি কবিতা আছে—

'যেমন বাণকে ধনুষের দরকার এবং ধনুষকে বাণ।'

তেমনি হনুমানকে দরকার রামের এবং রামকে হনুমান। বাস্তবে হনুমানজির পূজা দ্বারা শ্রীরাম প্রসন্ন হন, আবার শ্রীরামের আরাধনা করলে শ্রীহনুমান কৃপা করেন। ■

প্রশিক্ষণ বর্গ, প্রতিভা বিকাশ কেন্দ্র, মাদপুর, দক্ষিণবঙ্গ

মাতৃবাহিনী ও দুর্গাবাহিনীর পরিচিতি ও অভ্যাস বর্গ, বীরভূম, মধ্যবঙ্গ

আচার্য প্রশিক্ষণ বর্গ, মাদপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণবঙ্গ

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত : প্রকৃত জীবনের প্রতিফলন

রবিব্রত ঘোষ

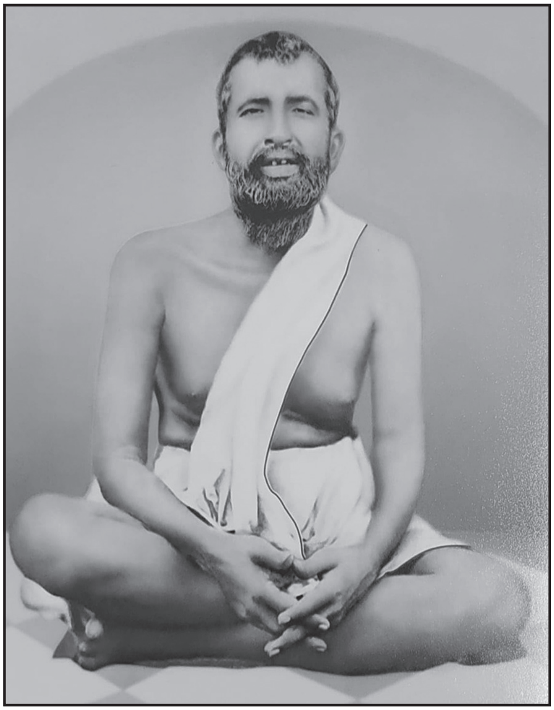

পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত এক মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলছি। দোর্দণ্ড প্রতাপ, প্রায় আড়াই দশক পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষ পদে ছিলেন। ধর্মে বিশ্বাস করতেন না। অথচ নিজের কাছের কয়েকজনকে যখন বহাল করা হতো উনি নিজে নাকি তাদের ইন্টারভিউ নিতেন। আর এই ইন্টারভিউতে একটা প্রশ্ন ভীষণ কমন ছিল যে প্রার্থী, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়েছেন কিনা?

নিজে ধর্ম মানেন না অথচ ধর্মীয় বই পড়েছেন কিনা সেটা জানতে চাইছেন? আসলে ব্যাপারটা অন্যরকম শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকে উনি মনে করতেন বাংলার লোক দর্পণ।

বাংলা লৌকিক সংস্কৃতি চিন্তাভাবনা লৌকিক জনজীবন, লৌকিক বিশ্বাস সমস্ত কিছুই এই কথামৃতর ভেতর নাকি লিপিবদ্ধ রয়েছে। ধর্মের ধারণাগুলো তার থেকে অনেকটাই দূরে, এটাই ছিল তার মত।

শ্রীরামকৃষ্ণের এটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বিরাট বড় পড়াশুনা ওনার ছিল না। প্রথাগতভাবে যাকে পণ্ডিত বলা হয় সেটা উনি ছিলেন না। অনেকেই নিরক্ষর বলে মনে করতেন যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে নিরক্ষর বলে কখনো দাবি করেননি। পরবর্তী গবেষণায় বোঝা গিয়েছিল উনার হাতের লেখা কিন্তু খুব সুন্দর ছিল।

সে যাই হোক কথামৃত পড়লে দেখা যায় বড় বড় তত্ত্বকথাকে উনি খুব সুন্দর সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের প্রথম দিকেই আছে। কথামৃতকার উনার কাছে গেছেন। ঈশ্বর সাকার না কি নিরাকার সেটা এই সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল, বিদ্বৎ সমাজ এই আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। বড় বড় পাজি পুঁথির উদাহরণ দেওয়া হতো, জটিল আলোচনা হতো। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই আলোচনার রাস্তায় গেলেনই না নিজস্ব অনন্য উপমা দেওয়ার স্টাইলে খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন জলকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে। জল কখনো নিরাকার, যে পাত্রে রাখবেন তারই আকার ধারণ করে আবার কখনো বরফ তার একটা নিজস্ব আকার আছে। সাকার বা নিরাকারের এক আশ্চর্য সমাধান। বা বলা যেতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের যেটা মূল বাণী মূল বার্তা এক আশ্চর্য সমন্বয়, এই বিবাদময় প্রশ্নের।

কথামৃত পড়লে বোঝা যায় কথামৃতকার এই ধরনের ব্যাখ্যার সঙ্গে অভ্যস্ত ছিলেন না, তাই তিনি খুব অবাক হয়েছিলেন।

এর আগেই কথামৃতকার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিন্দে ঝির কাছে জানতে চেয়েছিলেন হ্যাঁগো উনি কি খুব পড়াশোনা করেন? উত্তর পেয়েছিলেন, আর পড়াশোনা সমস্ত শাস্ত্র ওনার মুখে।

কথামৃত পড়লে এটা লক্ষ করা যায় বড় বড় তত্ত্ব কথা দর্শন এবং ধর্মের জটিল এবং কঠিন প্রশ্নকে উনি খুব সহজ ভাষায় অনবদ্য ভঙ্গিতে এক নতুন ধরনের উত্তর দিতে পেরেছিলেন। বড় উপদেশ কখনোই কাউকে দেননি সহজ সরল ছোট ছোট কথার মধ্যে দিয়েই মানুষকে মুগ্ধ করতে পেরেছিলেন।

অভিনবত্ব ছিল যুক্তি তর্কের বাইরে গিয়ে সত্যকে জানার জন্য ধর্মের মূল তত্ত্বকে বোঝার জন্য, নিজে পরীক্ষা করে দেখে নাও এই আহ্বান জানাতে পারতেন।

বিবেকানন্দের সঙ্গে বা নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ওনার প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনগুলি মনে করলে এটা খুব সুন্দর ভাবে বোঝা যায়।

নরেন্দ্রনাথ উনার কাছে গিয়েছিলেন এক জ্বলন্ত প্রশ্ন নিয়ে যেটা সেই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। সত্যিই কি ভগবান বলে কিছু আছে! নাকি একটি দার্শনিক ধারণা? শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যদের মতো হ্যাঁ না বা হেয়ালিপূর্ণ উত্তর নয়, খুব সরাসরি চ্যালেঞ্জের রাস্তায় হাঁটলেন। নরেন্দ্রনাথকে বললেন হ্যাঁ ঈশ্বর আছেন তাকে দেখা যায়। চাইলে তুমিও দেখতে পারো। এরকম উত্তর নরেন্দ্রনাথকে এর আগে কেউ কখনো দেয়নি। জটিল তত্ত্বের আলোচনা নয়, অনাবশ্যক শাস্ত্রকে কোট করা নয়, প্রশ্নের উত্তরে একটা পাল্টা চ্যালেঞ্জ। সাহস থাকে তো নিজে বুঝে নাও।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে লক্ষ করা যাবে ভারতীয় ধর্মগুলো সম্বন্ধে তখন অনেক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

একদল ছিল ব্রাহ্মসমাজ, তারা ধর্মকে কাটছাঁট করতে করতে ধর্মকে একটা তাত্ত্বিক আলোচনাসভাতে পরিণত করতে পেরেছিল।

ছিল ডিরোজিয়ানরা তারা ধর্ম সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন তুলতেন অধিকাংশই হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই এই ঘরানার কেউ কেউ ক্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন আবার অনেকেই হিন্দুধর্মতে ফিরে এসেছিলেন। বাস্তব ঘটনা হল এই আন্দোলন মানুষের জীবনে কোন দাগ কাটতে পারেনি।

হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যারা হিন্দু ধর্মের মূল তত্ত্বকে বাদ দিয়ে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার আচার বিচারকেই ধর্ম বলে চালানোর চেষ্টা করেছিলেন।

আর এই বিভ্রান্তির সুযোগটা নিতে পেরেছিল ক্রিশ্চান ধর্ম প্রচারকরা। এমনিতেই হিন্দু ধর্ম ছিল যথেষ্ট সংস্কৃত ভাষা নির্ভর। যা বোঝার মতো ক্ষমতা খুব কম লোকেরই ছিল। কারণ দেশের একটা বিরাট অংশই ছিল নিরক্ষর। এই জনসমাজের কাছে ক্রিশ্চান মিশনারীরা হিন্দুধর্মকে প্রায় ছেলেখেলার পর্যায়ে নামিয়ে এনে একটা হাস্যকর অবস্থায় নিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

হালটা বদলানো শুরু হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের হাত দিয়ে। উনি প্রথম দেখালেন ধর্ম মনে আচার বিচার নয়। ধর্মের মূল কথা আচার বিচারের উপর উঠে মূল তত্ত্বকে জানা। ভগবানকে উপলব্ধি করা। খুব সহজ ভাষায় বোঝাতে পেরেছেন, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর লাভ।

প্রথমদিকে ছোটখাটো আচার বিচারকে মেনে চললেও যত দিন গড়িয়েছে এর সীমাবদ্ধতা কোথায়? ঠিক কোন জায়গা থেকে আচার বিচারকে দূর করতে হবে সব বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন তার ভক্তগোষ্ঠিকে।

অবশ্য অন্যদের মতো ওনাকে গিয়ে কোথাও প্রচার করতে হতো না। খুব বেশি যে অন্যদের কাছে প্রচার করতে গেছেন তাও কিন্তু নয়। একবার তো দুঃখ করেই বলেছিলেন চৈতন্যদেব হেঁটে গোটা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন, আর উনি কিনা গাড়ি ছাড়া যাতায়াত করতে পারেন না।

দক্ষিণেশ্বর ওনার ঘরেতেই মানুষের যাতায়াত হত। ওনার জীবন দর্শন ও বাণীর আকর্ষণে।

এখানে কোন বাছ বিচার ছিল না জাতি বর্ণ ও ধর্মের কোন ভেদ ছিল না। কারণ উনি কোন ভেদকে পছন্দ করতেন না। নিজে যেমন হিন্দু ধর্মের যাবতীয় পথগুলো নিয়ে সাধনা করেছেন এমনকি হিন্দু ধর্মের বাইরে গিয়েও নিজের উপলব্ধিকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন।

একটা ঘটনা আছে, এক পথচারী একজনকে জিজ্ঞাসা করছেন স্টার থিয়েটারটি কোথায়? যাকে জিজ্ঞাসা করছেন তিনি একটি বিশেষ ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসী। তার মনে হয়েছিল স্টার থিয়েটার মানেই তো সেই মহিলারা যাদের চারিত্রিক বন্ধন একটু আলগা। উনি প্রশ্নকর্তাকে প্রথমে উত্তর দিয়েছিলেন জানি না। পরে মনে হল এটাও তো মিথ্যে কথা, উনি তো জানেন। এবার উত্তর দিলেন জানি কিন্তু বলবো না। কারণ ওই যে মহিলারা ওখানে যুক্ত আছেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণ! উনি স্টার থিয়েটার নাটক দেখতে গেছেন। বাহ্যিক কিছু না দেখে অভিনেত্রীদের মধ্যে আনন্দময়ীকে দেখতে পেলেন, তাদের অন্তর জগতকে দেখতে পেলেন। তাই আপাত অর্থে সমাজ থেকে বহু দূরে থাকা রীতিমতো লাঞ্ছিত এই মহিলারা শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে এসে উপস্থিত হল। বলা যেতে পারে তারা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আশ্রয় পেলেন বা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই তাদেরকে আশ্রয় দিলেন। এখন এর প্রাসঙ্গিকতা বোঝা যাবে না, কিন্তু সেই সময় এটা ছিল একজন ধর্মীয় শ্রদ্ধেয় মানুষের একটা রীতিমত বিদ্রোহ।

প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে যাওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার এই বিদ্রোহগুলো করেছেন কোন চটকদার সচকিত আওয়াজের মধ্যে দিয়ে নয়।

প্রচলিত ধারণায় ছিল গুরুকে প্রশ্ন করা যাবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্রোহ ছিল তার বিরুদ্ধেও একবার একজন উনার কাছে থেকেই একজনকে বলছেন উনি যা বলছেন তা মেনে নাও না।। শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে আপত্তি করছেন।

ভক্তদেরকে বলছেন ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন? চোখ কান খোলা রাখার কথা বলছেন।

কিন্তু তার থেকেও বড় কথা ছিল উনাকে প্রশ্ন করলে উনাকে পরীক্ষা করলে উনি খুশি হতেন। বিরক্ত বোধ করতেন না। নরেন্দ্রনাথ ওনার সঙ্গে রীতিমতো তর্ক করেছেন। উনার কথাকে, ওনার কথা দিয়েই বলা যেতে পারে বাজিয়ে নিয়েছেন।

নিজেই বলেছিলেন উনার নিজের ধাতুর স্পর্শ সহ্য হয় না। নরেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল এটা হতেই পারে না। রামকৃষ্ণের অজান্তেই নরেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণের বিছানার তলায় কতগুলো ধাতব মুদ্রা লুকিয়ে রেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানায় বসতেই তীব্র যন্ত্রণায় কাতরে ওঠেন। বিছানা ঝাড়া দিতেই মুদ্রাগুলো মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। কার কান্ড সেটা শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন উনি কোন প্রতিবাদ করেননি বরং আনন্দই পেয়েছিলেন যে এমন একটা শিষ্যকে পেয়েছে যে তাকে বারবার পরীক্ষা করে নিচ্ছে।

উনার আরেক শিষ্য রাত্রিবেলা ওনাকে বিছানায় দেখতে না পেয়ে মনে করেছিলেন উনি রাত কাটানোর জন্য নিজের স্ত্রীর কক্ষে গেছেন। তাই একটু লুকিয়েই অন্তরালে থেকে তিনি ঘটনার উপর নজর রাখছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ফিরে এসে তাকে দেখে বলেছিলেন ঠিকই করেছিস গুরুকে রাতে দেখবি দিনে দেখবি। ভারতবর্ষে গুরুগিরির ইতিহাসে কোন গুরুকে তার শিষ্যরা, এরকম করে পরীক্ষা নিচ্ছেন তাকে তিনি সমর্থন করছেন, তাতে আনন্দে সম্মতি জানাচ্ছেন এমন উদাহরণ পাবেন না।

আর পারতেন যেকোন সংশয় দূর করতে হাতে গরম প্রমাণ দিতে। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন এটা উপনিষদের কথা। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন ধর্ম প্রবক্তারা বারবার এটা আমাদেরকে বুঝিয়ে গেছেন। সংশয় ছিল নরেন্দ্রনাথের মধ্যে, একবার প্রকাশই করে ফেলেন ঘটিটাও ঈশ্বর বাটিটাও ঈশ্বর এটা কখনো হতে পারে? পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, সেই সময় এই ধারণাকে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন ছিল এমনকি তথাকথিত বড় বড় ধর্মাচার্যদের মধ্যেও। শ্রীরামকৃষ্ণ যুক্তি তর্কের রাস্তায় হাঁটলেন না, নরেন্দ্রনাথ খালি একবার স্পর্শ করলেন। ব্যাস তাতেই কাজ হয়ে গেল। নরেন্দ্রনাথের একটা দিব্যদৃষ্টি খুললো। গোটা জগতকে ঈশ্বরের রূপে দেখতে শুরু করলেন। বেশ কয়েকদিন যাবার পর নরেন্দ্রনাথ আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন।

নীরব শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা কিন্তু খুব স্পষ্ট এবং পরিষ্কার ও ভীষণ শক্তিশালী আর যাবতীয় সংশয়ের উত্তর দেবার উপযোগী। ধর্ম বিনোদনের আলোচনা নয়। ধর্মের প্রথম কথাই উপলব্ধি। তত্ত্বকে জানা। বাকি যে আচার-বিচার সমস্ত কিছু রয়েছে সে সবকিছু এই সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য। তাকে উপলব্ধি করার পর এই আচার বিচারের আর কোন প্রয়োজন নেই। এটা শাস্ত্রে বার বার বলা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তার জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। ■

শ্যামনগরে চক্ষুপরীক্ষা শিবির, দক্ষিণবঙ্গ

এক ঐশ্বরিক জাগরণ : শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম রহস্যময় অভিজ্ঞতা

বরিষণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনের সবচেয়ে অসাধারণ এবং অনন্য ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি ঘটেছিল যখন তিনি মাত্র ছয় বছর বয়সে ছিলেন। ঐশ্বরিক প্রকাশের এই মুহূর্তটি সেই বালকের আধ্যাত্মিক ভাগ্যের এক ঝলক দেয় যে পরবর্তীতে ভারতের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় রহস্যময় ব্যক্তিদের একজন হয়ে ওঠে।

বিস্তারিত ঘটনা : তরুণ গদাধর (রামকৃষ্ণের শৈশবের নাম) তার কামারপুকুর গ্রামের কাছে সবুজ মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। সেদিন ছিল একটি শান্ত দিন, এবং আকাশ অন্ধকার, বর্ষার মেঘে ঢাকা ছিল। তিনি যখন হাঁটছিলেন, তখন একটি অসাধারণ জিনিস তার নজরে পড়েছিল—গভীর, বজ্রধ্বনিপূর্ণ মেঘের পটভূমিতে সুন্দরভাবে উড়ন্ত এক ঝাঁক সাদা সারস। সাদা পাখি এবং অন্ধকার আকাশের মধ্যে আকর্ষণীয় বৈপরীত্য এক অতুলনীয় সৌন্দর্যের দৃশ্য তৈরি করেছিল, যা প্রায় অন্য জাগতিক বলে মনে হয়েছিল।

তিনি যখন সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তখন বিস্ময় এবং বিস্ময়ের এক অপ্রতিরোধ্য অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তার মন সেই মুহূর্তের সৌন্দর্যে সম্পূর্ণরূপে ডুবে গেল, এবং তার মনে হল যেন সে চেতনার এক উচ্চতর জগতে টেনে নেওয়া হচ্ছে। হঠাৎ, সে তার চারপাশের সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল এবং অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

গ্রামবাসীরা যারা তাকে মাঠে পড়ে থাকতে দেখেছিল তারা তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল, তার মঙ্গলের জন্য চিন্তিত ছিল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল, তখন সে এই অভিজ্ঞতাকে অবর্ণনীয় আনন্দ এবং ঐশ্বরিক পরমানন্দের অভিজ্ঞতা হিসেবে বর্ণনা করেছিল। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি অসীমের সাথে গভীর সংযোগ অনুভব করেছিলেন, যেন তিনি ক্ষণিকের জন্য ভৌত জগৎকে অতিক্রম করেছেন এবং প্রকৃতিতে উপস্থিত ঐশ্বরিক সত্তার আভাস পেয়েছেন।

আধ্যাত্মিক তাৎপর্য : এই ঘটনাটি কেবল বিস্ময়ের একটি ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত ছিল না; এটি রামকৃষ্ণের অসাধারণ আধ্যাত্মিক যাত্রার সূচনা করেছিল। অভিজ্ঞতাটিকে প্রায়শই বর্ণনা করা হয়।

ভাব-সমাধি : আধ্যাত্মিক পরমানন্দের একটি অবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তি ঐশ্বরিকের সাথে গভীর মিলন অনুভব করে। এত অল্প বয়সেও, রামকৃষ্ণ ঐশ্বরিক উপস্থিতিতে নিজেকে নিমজ্জিত করার একটি সহজাত ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন, এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা তার জীবন এবং শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করবে।

রামকৃষ্ণের কাছে এই অভিজ্ঞতা ছিল এক প্রকাশ যে ঈশ্বরকে প্রকৃতির সৌন্দর্যে দেখা এবং অনুভব করা যায়। এটি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার প্রতি তাঁর সংবেদনশীলতাকে আরও গভীর করে তোলে এবং পরবর্তীকালে উপলব্ধির ভিত্তি স্থাপন করে যে ঈশ্বর সকল রূপে বিদ্যমান—প্রকৃতিতে, দেবতাদের মধ্যে, অথবা মানুষের মধ্যে।

তাঁর জীবনের উপর প্রভাব : অতিচেতনার এই প্রাথমিক অভিজ্ঞতা রামকৃষ্ণের বিশ্বদৃষ্টি এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনকে গভীরভাবে রূপ দিয়েছে। এটি তাঁকে সৃষ্টির প্রতিটি দিকের ঐশ্বরিক উপস্থিতি সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন করে তুলেছিল, বিভিন্ন রূপ এবং পথে ঈশ্বরকে অনুভব করার জন্য তাঁর আজীবন অনুসন্ধানকে উৎসাহিত করেছিল। বয়স বাড়ার সাথে সাথে, ঐশ্বরিক পরমানন্দে নিজেকে হারিয়ে ফেলার এই ক্ষমতা তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে, যা অসংখ্য ভক্ত এবং সাধকদের অনুপ্রাণিত করে।

সকলের জন্য একটি শিক্ষা : শ্রীরামকৃষ্ণের শৈশবের এই ঘটনাটি দৈনন্দিন জীবনে আমাদের ঘিরে থাকা ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের স্মারক হিসেবে কাজ করে। এটি আমাদের চারপাশের জগতের সাথে থেমে থাকতে, পর্যবেক্ষণ করতে এবং সংযোগ স্থাপন করতে শেখায়, কারণ সহজতম মুহূর্তগুলোও অসীমের প্রবেশদ্বার হয়ে উঠতে পারে।

শ্রী রামকৃষ্ণের প্রথম রহস্যময় অভিজ্ঞতা তাঁর অনন্য আধ্যাত্মিক সংবেদনশীলতা এবং মানবতার জন্য ঐশ্বরিক জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হিসেবে তাঁর নির্ধারিত ভূমিকার প্রমাণ। ■

'যত মত তত পথ' হিন্দু ঐক্যের ভিত্তি

স্বামী মৃগানন্দ

(পুনর্মুদ্রণ)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজস্ব উপলব্ধি প্রসূত একটি মহাবাণী 'যত মত তত পথ।' এই বাণীটিকে ইদানীং বিপুলভাবে প্রচার করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে—'যত মত তত পথ' মানে হিন্দুধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম সব এক। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ইত্যাদি ধর্মমতকে এক জ্ঞান করেই নাকি এই বাণী উচ্চারিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্ম ইসলামধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম মতে সাধনায় সিদ্ধ হয়েই নাকি এই বাণীতে সব ধর্মমতকে সমান বলে ঘোষণা করেছিলেন।

তাঁর হিন্দুধর্মের সাধনার সঙ্গে ইসলামধর্ম ও খ্রীষ্টানধর্ম সাধনার কথা প্রায় অনিবার্যভাবে একসঙ্গে বলাটা এখন বলতে গেলে স্বাভাবিক রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে। এমনভাবে বোঝানো হচ্ছে যাতে মনে হবে, ঐ তিন ধর্মের সাধনায় তিনি প্রায় সমান সমান সময় ও শ্রম নিবেদন করেছিলেন।

কিন্তু যদিও আদতে অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের সারাজীবনের হিন্দুনিষ্ঠ সাধনা-সম্পৃক্ত একান্ন বৎসরের জীবনের মাত্র তিনদিন হচ্ছে সুফী মতের সাধনা এবং তিনদিন খ্রীষ্টভাবের আবিষ্ট অবস্থা। এ-দুটোকে যে পরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে অপপ্রচার করা হচ্ছে তাতে প্রচারকদের উদ্দেশ্য বিষয়ে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচরিত ও বাণীকেন্দ্রিক প্রামাণ্য মুদ্রিত গ্রন্থের হাজার পৃষ্ঠার মধ্যে তিন-চার পৃষ্ঠা মাত্রই ঐ দুই তথাকথিত ইসলাম ও খ্রীষ্টান সাধনার জন্য বরাদ্দ হয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক। এর কারণটা অবশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে যখন আমরা এই দুই তথাকথিত সাধনার বিবরণ বিশ্লেষণ করবো।

কিন্তু ইদানীং আবার শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় মাপকাঠিও ঐ একটাকেই ধরা হচ্ছে যে, তিনি ইসলাম সাধন করেছিলেন। একশ্রেণীর হিন্দু, উদারতার প্রমাণ দেওয়ার এক অজ্ঞাত তাগিদে, তাঁকে অহিন্দু বানিয়ে দেওয়ারই উপক্রম করেছেন। তাঁরই নামাঙ্কিত কোন প্রতিষ্ঠান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদের অহিন্দু বলে ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেননি। এর প্রভাব শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমূর্তিতে কিছুটা পড়ছে বইকি। সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকেই বেশ বিভ্রান্ত হচ্ছেন এবং শ্রদ্ধাও হারিয়ে ফেলছেন এটা আমরা লক্ষ্য করছি। আবার কোন কোন খ্যাতনামা লেখক তথাকথিত সর্বধর্মসমন্বয়কারীদের তীব্র সমালোচনা করতে গিয়ে রামকৃষ্ণদেবের ভাবমূর্তিকেই নামিয়ে ফেলছেন, তা ভাষার দৈন্যেই হোক কিংবা যথার্থ শ্রদ্ধার অভাবেই হোক।

কিন্তু ভাববার কথা, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ মহাবাণীর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে, সেটা কি আদৌ ঠিক? সত্যিই কি শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান এই তিন ধর্মের সাধনা করে ঐ বাণীটি উচ্চারণ করেছিলেন? যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, যিনি চৈতন্য, তিনিই স্বয়ং ভগবান রামকৃষ্ণ। তাঁর বাণী বেদবাণী। অতএব 'যত মত তত পথ' বলতে তিনি ঠিক কি বুঝিয়েছেন সেটা যথার্থ বুঝতে গেলে একটু গভীরে গিয়ে দেখতে হবে।

প্রথমেই দেখা দরকার শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোন্ সময়ে অর্থাৎ সাধনার কোন অবস্থায় সর্বপ্রথম এই বাণীটি উচ্চারণ করেছিলেন। ঐ ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে চিহ্নিত করলেই মূল কথাটি মূলতঃ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধক ভাবের প্রথম দিকে দেখা যায় তীব্র ব্যাকুলতার সাধনা। এই তীব্র ব্যাকুলতা তাঁকে করেছে উন্মাদবৎ। তিনি চরম ব্যাকুলতা নিয়ে মা ভবতারিণীকে ডাকতেন। ঠিক যেন মা হারা ছেলে। মায়ের জন্য পাগলের মতো কাঁদছেন। এটি ছিল রাগানুগা ভক্তির চরম সাধনা, ভক্তির এক অভিনব অধ্যায়। চিন্ময়ী মা শ্রীরামকৃষ্ণের 'মাথাকাটা' তপস্যায় সাড়া দিয়ে বাঁধা পড়ে গেলেন চিরকালের মতো। চিন্ময় মাতৃবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ হতে নিঃসৃত জ্যোতির সমুদ্র দর্শন করে তাতে নিমজ্জিত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই জ্যোতির্ময়ী মাকে কেন্দ্র করে তিনি লাভ করলেন দিব্যতম মাতৃভাবের চরম অবস্থা। মা

ভবতারিণী হয়ে গেলেন তাঁর নিত্যদিনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গী। মায়ের সঙ্গে চলতে লাগলো বহু কথা বহু লীলা।

তারপর দক্ষিণেশ্বরে এলেন সিদ্ধা সাধিকা ভৈরবী ব্রাহ্মণী। তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রহণ করলেন তন্ত্রপথের দীক্ষা। ভৈরবী এমন বিরাট আধার পেয়ে তাঁর সিদ্ধির সবটুকু উজাড় করে শ্রীরামকৃষ্ণকে করালেন চৌষট্টি তন্ত্রের সাধনা। বালকস্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ সাধনায় চরম সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হলেন অনায়াসেই। তন্ত্রের দিব্যাচারকে করলেন মাতৃভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বামাচারের পথকে নিরুৎসাহিত করলেন। এলেন জটাধারী নামক এক রামাইত সাধক। তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ নিলেন রামাইত সাধন। রামলালার বিগ্রহকে নিয়ে চললো নানা লীলা। বিগ্রহ জীবন্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার জগৎকে ভরিয়ে দিতে লাগলো চরম প্রাপ্তির আনন্দে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণব তন্ত্রমতে মধুর ভাবে সাধনা করলেন। ছয়মাস ধরে স্ত্রীবেশ ধারণ করলেন। সে সময় রাধাভাবে বিরহজ্বালা সহ্য করেছেন, অঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে অদ্ভুত সব সাত্ত্বিক বিকার। মহাভাবে তন্ময় হয়েছেন।

তারপর রূপরসযুক্ত ভক্তিভাবের মধুর সাম্রাজ্য থেকে হঠাৎ তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন জ্ঞানমার্গী সাধক তোতাপুরী। তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে এসে অবাক হয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখে। ভাবতে পারেননি সরস বঙ্গভূমিতে পাবেন কঠিন যোগমার্গের এমন আধার। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দিলেন বেদান্তের অদ্বৈত সাধনার দীক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সিদ্ধ অবস্থায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যানে বসে তিনি রূপের রাজ্য অতিক্রম করে নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। পরপর তিনদিন ঐরকম জড়বৎ স্থির হয়ে রয়েছেন দেখে তোতাপুরীও অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন। ওঁকার ধ্বনির মধুর উচ্চারণের সাহায্যে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনলেন তাঁর মনকে। নির্বিকল্প অবস্থায় আরোহণ করে অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভারতোদ্ভূত হিন্দুধর্মান্তর্গত বহুবিধ ধর্মমার্গের বিভিন্নভাবের সাধনার শেষে অদ্বৈতভাবের চরম অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েই ঘোষণা করেছিলেন—'যত মত তত পথ'। কারণ, এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার সাধনাতে তিনি যে চরম তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, সে সবই ঐ এক অদ্বৈতভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কাছে সগুণ নির্গুণ সাকার নিরাকার সব এক হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রকৃত সাধনভজনের সর্ববিধ পথ ঐ এক স্থানেই নিয়ে যায়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে' এই বিষয়ে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখেছিলেন—"অদ্বৈত ভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া ঠাকুরের এইকালে আর একটি বিষয়েরও উপলব্ধি হইয়াছিল। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ববিধ সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্য। কারণ, ভারতের প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মতাবলম্বনে সাধন করিয়া তিনি ইতঃপূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা প্রত্যেকেই হিন্দু ঐক্যের ভিত্তি সাধককে উক্ত ভূমির দিকে অগ্রসর করে। অদ্বৈতভাবের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি সেইজন্য আমাদিগকে বারংবার বলিতেন, 'উহা শেষ কথা রে শেষ কথা, ঈশ্বর প্রেমের চরম পরিণতিতে সর্বশেষে উহা সাধকজীবনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। জানিবি, সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত তত পথ।' ঐরূপে অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়া ঠাকুরের মন অসীম উদারতা লাভ করিয়াছিল। ঈশ্বরলাভকে যাহারা মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া শিক্ষা প্রদান করে ঐরূপ সকল সম্প্রদায়ের প্রতি উহা এখন অপূর্ব সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল।.... এখন হইতে তিনি ধর্মের একদেশী ভাব অপরে অবলোকন করিলেই প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ হীনবুদ্ধি দূর করিতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হইতেন।"

অতএব এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ভারতে উদ্ভূত হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন মতের সাধনায় রামকৃষ্ণদেব যে চরম অবস্থা লাভ করেন, সেখানে ঐ সব হিন্দু মত পথ এক হয়ে যায়। মন তখন প্রতিষ্ঠিত হয় ভূমায়। ভূমার সেই বিরাটত্ব, সেই অসীমত্ব শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তঃকরণকে করে দেয় পরম উদার। ঐ সময়, যে সব ধর্মমত ঈশ্বর লাভকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে শিক্ষা দেয়, সেই সব সমভাবাপন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলিকে তিনি উদার সহানুভূতির বশে একসূত্রে বেঁধে দিলেন। হিন্দুদের নিজেদের মতপথের মধ্যে চিরাচরিত যে বিবাদ বিভেদ রয়েছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যে একপেশে গোঁড়ামির মনোভাবে রয়েছে, সেসব ভিত্তিহীন, অথচ অকারণ ঝগড়া

করে তারা পরস্পর থেকে দূরে সরে থাকছে, এটা তিনি মেটাতে চাইলেন তাঁর নিজস্ব উপলব্ধিপ্রসূত সহজ উদার ঘোষণার মাধ্যমে। একথার প্রমাণ কথামৃতের বহুস্থানে বহুভাবে ছড়িয়ে রয়েছে।

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, এই উদার ঘোষণার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের তথাকথিত ইসলাম এবং খ্রীষ্টসাধনার ঘটনার প্রাদুর্ভাব হয়েছে ঐ মহাবাণী উচ্চারণের অনেক পরে। অতএব ঐ মহাবাণী শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের মহাসমন্বয়ের বাণী, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সমন্বয়ের বাণী নয়—এটা পরিষ্কার বোঝা যায়।

লীলাপ্রসঙ্গে সারদানন্দ মহারাজ লিখছেন—''অদ্বৈত বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঠাকুরের মন এখন কিরূপ উদার ভাবসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা আমরা এই কালের একটি ঘটনায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি।... ঐ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইবার পর ঠাকুর কয়েক মাসের জন্য রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। সেই ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পরে উল্লিখিত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।'' অদ্বৈতজ্ঞানের নির্বিকল্প অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর ছয়মাস ধরে ঠাকুরের কিছু রোগ ভোগ হয়। তারপর ঠাকুর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। ঐ সময় দক্ষিণেশ্বরে আসেন সুফী সাধক গোবিন্দ রায়। ইনি আদতে ছিলেন ক্ষত্রিয়, পরে ইসলামের সুফী সম্প্রদায়ের প্রচলিত শিক্ষা ও ভাবসহায়ে ঈশ্বরের উপাসনা করার পদ্ধতি তাঁর হৃদয় অধিকার করেছিল। কারণ, ঐ সম্প্রদায়ের দরবেশদের মতো তিনি ভাবসাধনে নিযুক্ত থাকতেন।

এই গোবিন্দ রায়কে দেখে ঠাকুরের মনে উঠলো ঐ মতে সাধনার কথা। লীলাপ্রসঙ্গের বিবরণে পাই—''তিনি ভাবিতে থাকেন, 'ইহাও তো ঈশ্বরলাভের এক পথ, অনন্তলীলাময়ী মা এ পথ দিয়াও তো কত লোককে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মলাভে ধন্য করিতেছেন। কিরূপে তিনি এই পথ দিয়া তাঁহার আশ্রিতদিগকে কৃতার্থ করেন, তাহা দেখিতে হইবে। গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া এই ভাবসাধনে নিযুক্ত হইব।... দীক্ষাগ্রহণ হিন্দু ঐক্যের ভিত্তি করিয়া যথাবিধি ইসলামধর্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঠাকুর বলিতেন, ''ঐ সময় আল্লা জপ করিতাম, মুসলমানদিগের ন্যায় কাছা খুলিয়া কাপড় পরিতাম, ত্রিসন্ধ্যা নমাজ পড়িতাম এবং হিন্দুভাব মন হইতে এককালে লুপ্ত হওয়ায় হিন্দু দেবদেবীকে প্রণাম দূরে থাকুক, দর্শন পর্যন্ত করিতে প্রবৃত্তি হইত না। ঐভাবে তিন দিবস অতিবাহিত হইবার পরে ঐ মতের সাধনফল সম্যক হস্তগত হইয়াছিল। ইসলামধর্ম সাধনকালে ঠাকুর প্রথমে এক দীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট সুগম্ভীর জ্যোতির্ময় পুরুষপ্রবরের দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। পরে সগুণ বিরাট ব্রহ্মের উপলব্ধিপূর্বক তুরীয় নির্গুণব্রহ্মে তাঁহার মন লীন হইয়া গিয়াছিল।''

এই তথাকথিত ইসলামসাধনার সময় বিশেষভাবে লক্ষণীয় হচ্ছে, ঠাকুরের মন থেকে হিন্দুভাব এককালে লুপ্ত হওয়া এবং দেবদেবীকে দর্শন পর্যন্ত করতে অনীহা। আল্লা মন্ত্র জপ এবং তিনবার নমাজের এই অনিবার্য ফল খুবই স্বাভাবিক। ইসলাম ধর্মে বলা আছে, আল্লার কোন শরিক নেই। আল্লা একা, তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে একাসনে বসানো যাবে না। দেবদেবীর মূর্তিপূজা ঘোর পাপ। মূর্তিপূজকরা কাফের। তাই সত্যস্বরূপ সরল সহজ শিশুভাবময় ঠাকুরের চিত্তে মূল ইসলামের এই তত্ত্ব সাময়িকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ঐ তিনদিন মাত্র সামান্য আকারে ইসলাম ভাবসাধন করতে গিয়ে।

এর একটা স্পষ্ট অর্থ এটাও দাঁড়ায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তথাকথিত ঐ ইসলাম সাধনার প্রভাবে প্রকৃতপক্ষে সাময়িকভাবে অনুভব করেছিলেন যে, সব মতই পথ নয়। কারণ, ইসলাম মতে দেবদেবীর মূর্তিপূজা অভীষ্ট লাভ করাতে পারে না। তাই দেবদেবীর পূজা তো অনেক দূরের কথা, প্রণাম বা দর্শনের প্রবৃত্তিও হয়নি। অর্থাৎ যেহেতু ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোনও মতকে মান্য করে না, সেহেতু ভারতের হিন্দুধর্মের দেবদেবীর পূজক এবং নিরাকারের উপাসক ইত্যাদি অসংখ্য মতপথের সাময়িকভাবে মিথ্যা হয়ে গেল। সাধনার ঠিক সেই সময় মধ্যে যে ঐক্যসূত্র তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তা ঐ ইসলামের প্রভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলতে বললে তাঁকে হয়তো বলতে হত যত মত তত পথ নয়, একমাত্র ইসলামই পথ। খুব রক্ষা, তা হয়নি। কারণ, তিমি বস্তুতঃ হিন্দু সাধকের মতোই ইষ্টলাভের সাধনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গেই আর একটা দিক নিয়ে ভাবার আছে। ইসলাম সাধনার তিনদিনের শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন করলেন এক দীর্ঘশ্মশ্রু বিশিষ্ট সুগম্ভীর জ্যোতির্ময় পুরুষপ্রবরকে। ইসলাম ধর্মে রূপের কোনও স্থান নেই, স্বীকৃতিও নেই। তবে এই যে রূপময় দর্শন এটা কি ইসলাম-সিদ্ধ হতে পারে? কখনই

নয়। কারণ, ইসলামধর্মে ঐরূপ কোনও দর্শন বা সিদ্ধির মান্যতা নেই। এর পরই দেখা যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ সগুণ বিরাট ব্রহ্মের উপলব্ধি করছেন এবং ক্রমে তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্মে তাঁর মন লীন হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ তাঁর এই সিদ্ধিলাভ অবশ্যই হিন্দুধর্মেরই সিদ্ধি।

এই নির্গুণ ব্রহ্মে পুনরায় এসে পড়েছে সেই অদ্বৈতভাবভূমির অবস্থান। সেখানে আবার এসে পড়েছে অসীম উদারতা। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ, প্রথমতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বধর্মনিষ্ঠায় সুপ্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত, তিনি সাধনা করেছেন সুফী মতে। সুফীদের সাধনা সাধারণতঃ হিন্দুদের সাবনার সঙ্গে খুবই সাদৃশ্যযুক্ত। সেখানে ব্রহ্মচর্য ত্যাগ তপস্যা সহজ ঈশ্বরকে পাওয়ার উদ্দেশ্য আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে। তাই সুফীদের মধে দেখা যায়, বহু সিদ্ধ সাধক পীর দরবেশ ফকির গোসাঁই ইত্যাদি নামে বিচরণ করেন। তাই সিদ্ধ অবস্থায় আবার যখন অদ্বৈতের উদারতায় মন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন তাঁর ধারণা হয়েছে, এভাবেও মা কৃপা করেন। অতএব এই তথাকথিত ইসলাম সাধনা কখনই ইসলাম সাধনা নয়, প্রকৃতপক্ষে নামান্তরে হিন্দু সাধনা।

হিন্দুধর্মের যে কোনও একটি মত বা পথে একই পূর্ণতা এবং একই আনন্দ প্রেম সহানুভূতি উদারতা পরিদৃষ্ট হয়, কারও মান্যতার প্রতি ঘৃণা উৎপন্ন হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বধর্মে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ বলেই ইসলামের অতি সাময়িক প্রভাব তাঁর আসল সত্তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। দেবদেবীর প্রতি অতি সাময়িক বিরূপতা চরম অবস্থায় গিয়ে আপনিই কেটে গেছে।

সুফী গোবিন্দ রায় মুসলমান বেশধারী হলেও বস্তুতঃ ছিলেন হিন্দুদের সাধনমার্গেরই অনুসারী। শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ তিনদিনের সাধনায় প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দ রায় প্রমুখ বিশিষ্ট সুফীদের অনুসৃত পথ ঈশ্বরলাভের পথ বলে চিহ্নিত ও স্বীকৃত হয়েছে, মূল এবং সমগ্র ইসলাম নয়। অতএব শ্রীঠাকুরের 'যত মত তত পথ' উক্তিটিকে মূল ইসলামের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়াটা নিতান্তই ভুল কাজ।

ঐ বিষয়ে স্বামী সারদানন্দ নিজের মন্তব্যও দিয়েছেন ''বেদান্ত-সাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের মন অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি কিরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্বোক্ত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায় এবং একমাত্র বেদান্তবিজ্ঞানে বিশ্বাসী হইয়াই যে ভারতের হিন্দু এবং মুসলমানকুল পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন এবং ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ হইতে পারে, একথাও হৃদয়ঙ্গম হয়। নতুবা ঠাকুর যেমন বলিতেন, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেন একটা পর্বত-ব্যবধান রহিয়াছে-পরস্পরের চিন্তাপ্রণালী, ধর্মবিশ্বাস, ও কার্যকলাপ এতকাল একত্রবাসেও পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে। ঐ পাহাড় যে একদিন অন্তর্হিত হইবে এবং উভয়ে প্রেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবে, যুগাবতার ঠাকুরের মুসলমানধর্ম সাধন কি তাহারই সূচনা করিয়া যাইবে?"

যাঁরা ইসলামের গ্রন্থ এবং ইতিহাস অনুধাবন করেছেন তাঁরা সহজেই বুঝতে সক্ষম হবেন যে, মুসলমানকুলের পক্ষে 'একমাত্র বেদান্ত-বিজ্ঞানে বিশ্বাসী' হওয়া কখনই সম্ভব নয়, যদি তারা তাদের ইসলামধর্মকে বজায় রাখে। ইসলামধর্মকে ধরে রাখতে গেলে তাদের একইসঙ্গে পূর্ণ ইমান আনতে হবে কোরাণের ওপর, আল্লার ওপর এবং আল্লার একমাত্র ও শেষ রসুল মহম্মদের ওপর। অন্য কোনও মতপথ অনুসারী হওয়া চলবে না। অর্থাৎ বেদান্ত বিজ্ঞানে বিশ্বাসী হতে গেলে তাঁদের ঐ পূর্ণ ইমান ত্যাগ করতে হবে। এমনটি কোনও দিন হতে পারে—এই আশার ছলনায় বিমোহিত হয়ে হিন্দুরা কালযাপন করতে পারে, কিন্তু সত্যিকার ইমানদার মুসলমানকুল কোনওকালে স্বধর্মত্যাগ করে বেদান্তবিজ্ঞানের মার্গে দীক্ষিত হবে—এটা সাধারণ ভাবে তারা কল্পনাও করতে পারে না।

অতএব সবদিক থেকে খতিয়ে দেখলে এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি 'যত মত তত পথ' মূল ইসলামধর্মকে জড়িয়ে নয় এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণও ঐ উক্তিকে নিজেদের সঙ্গে জড়িয়ে মেনে নিতে পারেন না, কারণ সেটা তাঁদের শাস্ত্র নির্দেশ বিরুদ্ধ।

হিন্দুধর্মান্তর্গত প্রধান কয়েকটি সাধনমার্গের বহুবিধ ভাবসাধনায় চরম অবস্থা লাভ করার প্রায় ছয় মাস পর সুফী সাধনায় সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত। হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তারও এক বছর পর উপস্থিত হয়েছে তথাকথিত খ্রীষ্টান সাধনার ঘটনা। তথাকথিত বলা হচ্ছে এইজন্য যে, খ্রীষ্টান ধর্মে ঠাকুরের কোনও আনুষ্ঠানিক দীক্ষা বা ব্যাপ্টাইজিং হয়নি। কোনও বিশেষ বিধি বা মার্গ অনুসরণ করে কোনও সাধনাও করেননি যাকে বলা যায় খ্রীষ্টধর্ম সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণের খ্রীষ্টান সাধনা নামে যা প্রচারিত হচ্ছে তা

আসলে কোনও সাধনা নয়, শুধুমাত্র একটা ভাবাবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে এ বিষয়ে যে বর্ণনা আছে তা অনুধাবনযোগ্য। স্বামী সারদানন্দ লিখছেন—''এই কালের এক বৎসর পর কিন্তু ঠাকুরের মন আবার অন্য এক সাধনপথে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দর্শন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। তখন তিনি শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিকের সহিত পরিচিত হইয়াছেন এবং তাঁহার নিকটে বাইবেল শ্রবণপূর্বক শ্রীশ্রীঈশার পবিত্র জীবনের এবং সম্প্রদায় প্রবর্তনের কথা জানিতে পারিয়াছেন। ঐ বাসনা মনে ঈষন্মাত্র উদয় হইতে না হইতে শ্রীশ্রীজগদম্বা উহা অদ্ভুত উপায়ে পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, সেই হেতু উহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় নাই।"

ঘটনার উৎসস্থল দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির কাছে যদুমল্লিকের বাগানবাড়ী। ঠাকুর সেখানে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন। বৈঠকখানার দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিল মাতা মেরীর কোলে শিশু যীশুর ছবি। ঠাকুর সেদিন তন্ময় হয়ে ঐ ছবিটি দেখছেন আর যীশুর কথা ভাবছেন। এমন সময় ছবিটি তাঁর সামনে জীবন্ত জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো এবং সেই জ্যোতিঃরশ্মি তাঁর অন্তরে প্রবেশ করলো। সেই মুহূর্তে ঠাকুরের জন্মগত হিন্দুসংস্কার বিলীন হয়ে গেল এবং বিজাতীয় সংস্কার অন্তরকে গ্রাস করলো। তখন দেবদেবীর প্রতি ঠাকুরের অনুরাগ ভালবাসা সব হারিয়ে গেল। যীশুখ্রীষ্ট ও তাঁর পারিষদ পাদরীদের প্রার্থনামন্দির ইত্যাদির দর্শন হতে লাগলো ভাব-তন্ময় অবস্থায়। শ্রীশ্রীজগন্মাতার মন্দিরে যাওয়ার কথা ভুল হয়ে গেল। তিনদিন ঐ ভাবতরঙ্গ ঠাকুরকে আবিষ্ট করে রাখলো। তারপর পঞ্চবটীতে বেড়াতে গিয়ে দেখলেন, একজন সুন্দর গৌরবর্ণ অপরিচিত দেবমানব তাঁর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসছেন। লীলাপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে ''ঠাকুর দেখিয়াই বুঝিলেন ইনি বিদেশী এবং বিজাতিসত্ত্বত। দেখিলেন, বিশ্রান্ত নয়নযুগল ইহার মুখের অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে এবং নাসিকা একটু চাপা হইলেও উহাতে ঐ সৌন্দর্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম সাধিত হয় নাই। ঐ সৌম্য মুখমণ্ডলের অপূর্ব দেবভাব দেখিয়া ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং বিস্মিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—কে ইনি? দেখিতে দেখিতে ঐ মূর্তি নিকটে আগমন করিল এবং ঠাকরের পূত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ঈশামসি'।...তখন দেবমানব ঈশা ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শরীরে লীন হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ঠাকুরের। মন সগুণ বিরাট ব্রহ্মের সহিত কতক্ষণ একীভূত হইয়া রহিল।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর এই দর্শনের পর ঈশাকে অবতার বলে মেনেছেন, সেটা আলাদা কথা। আমাদের একটু তলিয়ে দেখতে হবে ঐ তথাকথিত খ্রীষ্টান সাধনার বিষয়টিকে। দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ নূতন নূতন ভাবে চাইছেন শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন। সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হচ্ছে কখনও মাতৃরূপ দর্শনে, কখনও সগুণব্রহ্মের সঙ্গে একাকারিত্বে, কখনও নির্বিকল্প নির্গুণ নিরাকার অবস্থায়। এর কোনওটাই খ্রীষ্টান মতের উপলব্ধির বস্তু নয়।

ঠাকুর মেরী এবং যীশুকে দেখছেন তন্ময় হয়ে। সেখান থেকে জ্যোতিঃরশ্মি অঙ্গে প্রবেশ করায় তিনি ভাবস্থ হলেন এবং সেই ভাব তিন দিন স্থায়ী হোল। সে অবস্থায়, ইসলাম সাধনার সময় যেমন হয়েছিল ঠিক তেমনই, দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা বিলুপ্ত হোল। এর কারণ, খ্রীষ্টানরা দেবদেবী মানে না, হিন্দুদের বলে পৌত্তলিক। পৌত্তলিকতা তাদের দৃষ্টিতে অধর্ম এবং কুসংস্কার। তাই ঐ বিজাতীয় ভাবাবেশে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার মন্দিরেও যাচ্ছেন না। তাহলে বলা যায়, ইসলাম সাধনার সময় যেমনটি হয়েছিল, ঠিক তেমনিই ঐ সময়টিতেও ঠাকুরের কাছে প্রতিভাত হয়েছে—যত মত তত পথ নয়। কারণ, খ্রীষ্টান মতে দেবদেবীর পূজা কখনই অভীষ্ট লাভ করাতে পারে না। বাইবেল গ্রন্থে খ্রীষ্টান ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী মোসেস্ থেকে যীশু পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতিনিধি কিংবা পুত্রের মুখে ব্যক্ত হয়েছে। সর্বত্র একই ভাব-প্রফেট এবং তাঁর গড় ছাড়া অপর কারও মত বা পথে বিশ্বাস রাখা চলবে না। একমাত্র প্রফেটই পরিত্রাতা। গড্ তাঁর একমাত্র প্রতিনিধি বা একমাত্র পুত্রের মাধ্যমেই মানুষকে তাঁর বাণী শুনিয়েছেন। সেখানে অন্য কারও স্থান নেই। ইসলামের মতোই খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরও অপর কাউকে তাঁর পাশে সহ্য করতে পারেন না। আর একমাত্র প্রফেট ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে ঈশ্বর কথা কইতেও পারেন না। অতএব খ্রীষ্টান মত ছাড়া অন্য মত কী করে পথ বলে গ্রাহ্য হবে? তাই দেবদেবীর মন্দির সাময়িকভাবে পরিত্যজ্য হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ খ্রীষ্টান ভাবাবেশের সময়। *(ক্রমশ)*

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব : মানব চেতনার অবতার

পারমিতা পাল

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি বর্তমান নদীয়া জেলার নবদ্বীপ ধামে পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র ও শচী দেবীর গৃহে ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথিতে এক বালক জন্মগ্রহণ করে। ওই বালকের নাম বিশ্বম্ভর মিশ্র রাখা হয়। বাবা ও মা দুজনেই খুব ধার্মিক প্রবৃত্তির ছিলেন, ফলে ওই বালক অত্যন্ত ধার্মিক ও ভক্তিভাবে সমৃদ্ধ ছিল। প্রকৃতি ওঁনাকে অত্যন্ত রূপরাজি প্রদান করেছিলেন এবং ওঁনার গায়ের রঙ অত্যন্ত গৌড়বর্ণ ছিল, তাই ওঁনাকে সবাই গৌরাঙ্গ বলে ডাকতে শুরু করেছিল। আবার নিম গাছের নীচে ওঁনার জন্ম হয়েছিল বলে, ওঁনাকে নিমাই বলেও ডাকা শুরু হয়। নিমাইকে পুস্তকীয় জ্ঞান প্রদান করেন গঙ্গাদাস নামে একজন পণ্ডিত। অল্পদিনেই শিক্ষা অর্জন করে, নিমাই স্বয়ং পরিবার পালনের জন্য শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। ওঁনার বিবাহ বিষ্ণুপ্রিয়া নামক অত্যন্ত সুন্দরী বুদ্ধিমত্তা কন্যার সঙ্গে হয়েছিল। বিবাহিত জীবন অত্যন্ত ভালোভাবেই কাটছিল এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অপূর্ব প্রেম দেখে বন্ধুরা ওনাকে রসিক শিরোমণি বলা শুরু করে দেয়।

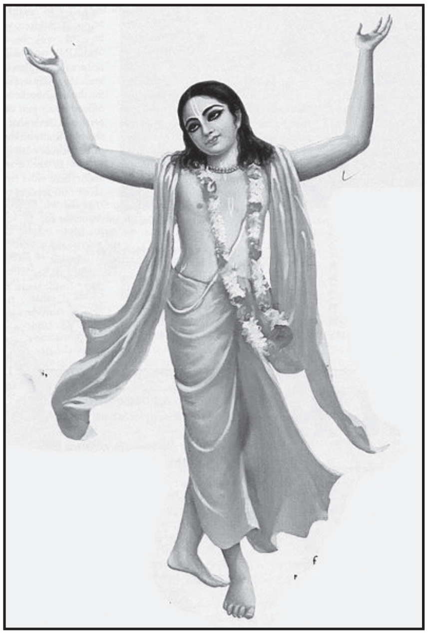

সেই সময় নবদ্বীপ ধাম সংস্কৃত জ্ঞাতা পণ্ডিতদের কেন্দ্র ছিল। তখন প্রথা ছিল পাণ্ডিত্যের দিকবিজয় করার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্ডিতরা নবদ্বীপে আসতেন, শাস্ত্রার্থ করার জন্য। এইভাবে কেশব কাশ্মীরি নামক একজন পণ্ডিত নবদ্বীপে হাজির হলেন। একদিন হঠাৎই কেশব কাশ্মীরির সঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের সাক্ষাৎ হয়ে গেল। সকলের আগ্রহে কেশব পণ্ডিত এক স্বরচিত সংস্কৃত পদ্য শোনালেন। তখন চৈতন্যদেব বললেন এই পদ্যের আলোচনা করে, এর দোষ-গুণ সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন কেশব বললেন, যে যদি কেউ এই পদ্য মুখস্ত শোনাতে পারে, তাহলে তিনি এই সম্পর্কে আলোচনা করবেন। কেশব ভেবেছিলেন, মাত্র একবার শুনে কেউ সেই পদ্য শোনাতে পারবে না। কিন্তু চৈতন্যদেব গড়গড় করে তা শুনিয়েছিলেন, শুধু তাই নয় ওই পদ্যের আলোচনা পর্যন্ত করে দেন। এই অদ্ভুত স্মরণশক্তি ও পাণ্ডিত্য দেখে কেশব অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে নবদ্বীপ ছেড়ে চলে যান।

চৈতন্যদেবের এক সহপাঠী রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্র সম্পর্কে একটি গ্রন্থে লিখেছিলেন। তিনি ভাবলেন তাঁর থেকে ভালো কেউ আর এই গ্রন্থ লিখতে সক্ষম নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে চৈতন্যদেবও একটি গ্রন্থ লিখেছেন ন্যায় শাস্ত্রের উপরে। এই সংবাদ শুনে রঘুনাথের মনে ঈর্ষা জাগ্রত হল। চৈতন্যদেবের সঙ্গে নদী বক্ষে নৌকায় বিচরণের সময় চৈতন্যদেবের গ্রন্থ শুনতে লাগলো রঘুনাথ। তিনি বুঝতে পারলেন, যে চৈতন্যদেবের লেখা ন্যায় শাস্ত্রের গ্রন্থটি তাঁর লেখা গ্রন্থের থেকেও উত্তম। পরিশ্রম বৃথা হয়ে যাবে এই ভেবে কাঁদতে লাগলেন, রঘুনাথ। শ্রীচৈতন্যদেব রঘুনাথের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে, সেই গ্রন্থ ছিঁড়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলেন এবং বললেন বন্ধু তোমার ঈর্ষাকে শান্ত করো। তোমার ঈর্ষা নিবারণের জন্য আমার গ্রন্থ গঙ্গামাকে সমর্পিত করলাম।

জগন্নাথ পুরী থেকে প্রসিদ্ধ সন্ত মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রী ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপে আসেন এবং অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত নামক একটি গ্রন্থ লেখেন। সেই গ্রন্থে কোন ভুল আছে কিনা, দেখবার জন্য চৈতন্যদেবকে বললেন। তখন চৈতন্যদেব বলেন, ‘শ্রীকৃষ্ণ কথার মধ্যে শুদ্ধি অথবা অশুদ্ধি কি? আপনি ভক্তিভাবে যা কিছু ভক্তদের বলেন, সেটাই শুদ্ধ। আপনি শ্রীকৃষ্ণের সত্য ভক্ত, তাই অশুদ্ধির প্রশ্ন উঠতেই পারে না’। বাস্তবে চৈতন্যদেবের মধ্যে উদারতা এবং অন্যের

গুণের প্রতি আদর ভাব সর্বদাই বিরাজ করত। তাই তিনি বৃথা মতভেদ কিংবা বিবাদ, কটুতা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন ধর্মের আচরণ করো এবং বিষয় বাসনা রূপী যে স্বার্থভাব আছে সেটাকে ত্যাগ করো। সৎসঙ্গ করে ভোগ এবং লৌকিকতার ইচ্ছাকে মন থেকে বাহির করো। পরনিন্দা, পরচর্চা ত্যাগ করে ঈশ্বরের সেবা এবং চর্চায় জীবন অর্পণ করো।

চৈতন্যদেবের জীবনের আরম্ভ থেকেই পরোপকার এবং উদারতা পূর্ণভাব ছিল। কিন্তু হাস্য, বিনোদন এবং রসিকতার মাত্রা কম ছিল না। ফলে ওঁনার শুভচিন্তা কারীদের মনে হীন মনোভাব উৎপন্ন হতো, এই ধরনের একজন ব্যক্তি ছিলেন পণ্ডিত শ্রীবাস, তিনি চৈতন্যদেবের বাবার বন্ধু ছিলেন। তিনি একদিন নিমাইকে ডেকে বললেন, 'নিমাই তুমি তোমার বাবার মতো পরম বৈষ্ণব কেন হচ্ছো না?' তখন নিমাই বলেছেন, 'আর কয়েকদিন যাক, তখন আমি পূর্ণরূপে বৈষ্ণব হয়ে যাবো'। তখন পণ্ডিত শ্রীবাস বলেছেন, 'তোমার মতন বিদ্বান ও লোভহীন পণ্ডিত বৈষ্ণব হলে জগতের কল্যাণ হবে'। এই ঘটনার কিছুদিন পরই বাবার মৃত্যু হলে, চৈতন্যদেব বাবার শ্রাদ্ধ করার জন্য গয়া ক্ষেত্রে গেলেন। সেখানে মন্দিরে গদাধারী ভগবানের মূর্তির সামনে ভক্তরা মধুর কণ্ঠে মহিমা স্তোত্র পাঠ করছিলেন। চৈতন্যদেব স্তোত্র শুনতে শুনতে ধ্যানস্ত হয়ে গেলেন এবং ভগবানের শ্রীচরণের দর্শন লাভ করলেন। সৌভাগ্যবশত সেখানে ঈশ্বরপুরী মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। সমস্ত কিছু বুঝতে পেরে চৈতন্যদেব, ঈশ্বর পুরী মহারাজের পা ধরে বললেন, 'মহারাজ আমার গয়াধাম যাত্রা সফল হয়েছে। আপনার মতো মহাপুরুষের পুণ্যদর্শন আমার চরম সৌভাগ্যবশতঃ হয়েছে। আপনি আমার গুরুরূপে আমাকে সাংসারিক মোহজাল থেকে মুক্ত করুন'। চৈতন্যদেবের আগ্রহে ঈশ্বরপুরী মহারাজ ওঁনার কানে দীক্ষামন্ত্র দিলেন। তখন চৈতন্যদেব ভাবের জগতে পৌঁছে গেলেন এবং নবদ্বীপ থেকে আগত বন্ধুদের বললেন, 'তোমরা ফিরে যাও, আমি তো বৃন্দাবন যাবো'। তখন ঈশ্বরপুরী মহারাজ বললেন, 'তার আগে তুমি একবার বাড়ি ফিরে যাও এবং মাতা ও স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে আসো'। গুরুর আদেশে চৈতন্যদেব কিছুদিনের জন্য নবদ্বীপ ফিরে এলেন।

চৈতন্যদেবের মনে হিন্দুদেরকে ধর্মের প্রতি জাগৃতি রক্ষার সংকল্প এল, কিন্তু তিনি অনুভব করলেন এই কাজ করবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। তাই মাত্র ২৪ বছর বয়সেই তিনি এক রাত্রে গঙ্গা পার করে সন্ত কেশব ভারতীর আশ্রমে উপস্থিত হয়ে, সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য দীক্ষা নেন। কেশব ভারতী মহারাজ চৈতন্যদেবের কানে নারায়ণ মন্ত্র দিয়ে দিলেন, ফলে চৈতন্যদেব ভাবের সাগরে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর সঙ্গে আসা, নিত্যানন্দ 'হরিবোল, হরিবোল' মন্ত্র উচ্চারণ করে ওঁনাকে জাগ্রত করেন। তখন গুরু তাঁকে গৈরিক বস্ত্র, কমণ্ডলু ও দ্বণ্ড প্রদান করলেন। চৈতন্যদেবের ভক্তি ভাব দেখে তিনি ওঁনার নাম কৃষ্ণ চৈতন্য রাখলেন। অন্যদিকে পুত্র বিয়োগে মাতার মনে আঘাত লাগলেও তিনি জগৎকল্যাণের কাজে পুত্রকে সন্ন্যাস নেবার অনুমতি দিলেন।

যদিও চৈতন্যদেব ভক্তি মার্গের অনুযায়ী ছিলেন এবং ওঁনার সাধনার মার্গ নাম কীর্তন ছিল, কিন্তু তিনি শিষ্যদের পরোপকার, সমাজের জন্য ত্যাগ, বলিদান দেবার শিক্ষা দিতেন। অল্প দিনেই চৈতন্যদেবের নাম কীর্তন দেশের বিভিন্ন ভাগে প্রচার লাভ করতে লাগলো। খুব তাড়াতাড়ি নিত্যানন্দ নামক একজন সন্ন্যাসী ওঁনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এর কিছুদিন পরই হরিদাস নামক একজন ব্যক্তি শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এই হরিদাসের জন্ম মুসলিম পরিবারে হয়েছিল। ছোটবেলায় বাবা, মা না থাকায় ভিক্ষা করে জীবন যাপন করতেন। সেই সময় কৃষ্ণ ভজন শুনতে শুনতে তপস্যারত জীবন যাপন করতে লাগলেন এবং যবন হরিদাস নামে খ্যাতি লাভ করলেন। হরিদাস নবদ্বীপে আসার পর, চৈতন্যদেবের কীর্তনে যোগ দেন এবং খুব তাড়াতাড়ি চৈতন্যদেবের অনন্য শিষ্য হয়ে গেলেন। সেই সময়েই নদীয়াতে জগাই এবং মাধাই নামের দুই ভাই ছিল। তারা সব সময় মদ্যপান করে ঝগড়াঝাঁটি করতেন এবং অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। যদিও তারা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন, তবুও এই দুই ভাই চৈতন্যদেবের ভজন কীর্তনের বিরোধিতা করত। একদিন জগাই, মাধাই হরিদাসকে ভজনরত অবস্থায় লাঠি দিয়ে মার শুরু করলে, চৈতন্যদেব ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু হরিদাস চৈতন্যদেবের চরণ ধরে ওঁনাকে শান্ত হতে বললেন। তখন চৈতন্যদেব ক্রোধ ত্যাগ করে, দুষ্ট জগাই, মাধাইকে আলিঙ্গন করে জড়িয়ে ধরলেন। চৈতন্য দেবের স্পর্শ মাত্রেই তাদের নীচতা নষ্ট হয়ে চৈতন্যের উদয় হল। তারা দুজনে চৈতন্যদেবের উদারতা দেখে অনুশোচনা

করে, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন এবং পরে নাম কীর্তনের প্রচারক হয়ে গেলেন।

নদীয়ার কাজী চাঁদ খাঁ হরিকীর্তন বন্ধ করার আদেশ দিলেন। তখন চৈতন্যদেব নিতাই এবং হরিদাসকে বললেন, 'সম্পূর্ণ নগরে ঘোষণা করে দাও, যে আজ বিকেলে সবাই মশাল নিয়ে নগর কীর্তন করবে'। ঘোষণার পর কয়েক হাজার মানুষ মশাল হাতে হরিবোল, হরিবোল বলে নগর কীর্তনে বাহির হয়ে কাজীর বাড়ির সামনে উপস্থিত হল। সবাই কাজীকে মারার জন্য চিৎকার শুরু করলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব বললেন, 'কাজীকে আমরা কেবলমাত্র হরিবোল কীর্তন শোনাবো'। তারপর তিনি কাজীকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, 'কাজী সাহেব আমরা তোমার বাড়ির প্রাঙ্গণে ভজন করতে চাই মাত্র।' কাজী খুব লজ্জিত হয়ে চৈতন্যদেবকে বললেন, 'আজ থেকে আমি ভজন কীর্তন না করার আদেশ প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনারা কীর্তন কেবলমাত্র জনকল্যাণের জন্যই করছেন, কাউকে ক্ষতি করা কিংবা কষ্ট দেবার জন্য না।' এরপর থেকে সাধারণ মানুষের মনে হরিনাম কীর্তন করার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ বেড়ে গেল।

চৈতন্যদেব তাঁর সাথী নিত্যানন্দকে নিয়ে জগন্নাথ পুরীর পথে রওনা হলেন। তখন বাংলার শাসক এবং উড়িষ্যার শাসক রাজা প্রতাপরুদ্রর মধ্যে বিবাদ চলছিল। কিন্তু তাও চৈতন্যদেবকে বিনা বাধায় ওড়িশায় প্রবেশ করতে দিল সৈনিকরা। জগন্নাথ পুরীতে চৈতন্যদেব নাম কীর্তন প্রচার করার পর স্থির করলেন, সারা ভারতবর্ষে তিনি নাম কীর্তনে প্রচার করবেন। তিনি কৃষ্ণদাস নামক সেবককে নিয়ে দক্ষিণ ভারতের পথে যাত্রা করলেন। গোদাবরী নদীর তটবর্তী বিদ্যানগরের রাজা রামানন্দ ওঁনাকে খুব সমাদর করলেন। তারপর চৈতন্যদেব ত্রিবান্দম, মাইসোর, কর্ণাটক, নাসিক, পণ্ডরপুর ইত্যাদি স্থানে যাত্রা করলেন। সেখান থেকে দ্বারিকা হয়ে, বিজয়নগর রাজ্য হয়ে, জগন্নাথ পুরীতে প্রায় ২ বছর পরে ফিরে এলেন।

জগন্নাথ পুরী ফিরে এলে উড়িষ্যার রাজা রুদ্রপ্রতাপ, তাঁর গুরু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে, চৈতন্যদেবকে রাজভবনে নিয়ে আসার অনুরোধ করলেন। তখন চৈতন্যদেব বললেন, 'সন্ন্যাস নেবার পর আমার রাজভবনে কোন কাজ নেই।' তখন মহারাজ স্বয়ং সাধারণ বেশে চৈতন্যদেবের কাছে এসে, ভাগবত গীতার শ্লোক শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলেন। এর কিছুদিন পর, চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাত্রা করলেন এবং পথের মধ্যে প্রয়াগরাজে সন্ত বল্লভাচার্যের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এইভাবে ২৪ বছর ভক্তিমার্গ দ্বারা হিন্দু সংগঠন এবং নবজাগরণের কাজ করেন চৈতন্যদেব। একবার ভাববেশে তিনি সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করলেন, কিন্তু কিছু মল্লাহরা ওঁনাকে সমুদ্র থেকে তুলে নিয়ে আসেন। এই ঘটনার পরে একদিন কথা শুনতে শুনতে উঠে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তির সামনে প্রার্থনা করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। ■

বুক স্টল, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণবঙ্গ

সেবা কার্যক্রম, সুন্দরবন, দক্ষিণবঙ্গ

মহাশিবরাত্রি

আলপনা ঘোষাল

মহাশিবরাত্রি বা শিবরাত্রি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু ধর্মীয় উৎসব। এই মহাশিবরাত্রি বর্ষপঞ্জিতে দিনটি ফেব্রুয়ারি বা ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে পালিত হয়। মহাশিবরাত্রি হল হিন্দু ধর্মের সর্বোচ্চ আরাধ্য দেবতা দেবাদিদেব মহাদেব শিবের মহারাত্রি। শিবপুরাণ অনুসারে প্রতি মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে মাসিক শিবরাত্রির উপবাস ও পুজো করা হয়। শ্রাবণ মাস প্রদোষ ব্রত অর্থাৎ ভগবান শিবের উপাসনা এবং জলাভিষেক করা হয় আচার মেনে। অন্যদিকে শিবরাত্রি হল সেই মহারাত্রি যা শিব উপাসনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই উৎসব দৈব অবতারের শুভ উৎসব। নিরাকার থেকে তাঁর অবতারের রাতকে বলা হয় মহাশিবরাত্রি। এই কারণে এই রাতটিকে প্রতিবছর মহাশিবরাত্রি হিসেবে পালন করা হয়, ভগবান শিবের জ্যোতির্লিঙ্গ প্রকাশ হিসেবে। শিবপুরাণ অনুসারে ভগবান শিব প্রথম ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে লিঙ্গ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে যে, আকাশ নিজেই লিঙ্গ তথা পৃথিবী তার পিঠ বা ভিত্তি এবং সবকিছুর অসীম শূন্য থেকে জন্মেছে, তার মধ্যে প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, বর্ণ উৎপন্ন হচ্ছে। নিরন্তর ওঁম-ওঁম ধ্বনিত হচ্ছে। এই কারণে তাঁকে লিঙ্গরূপ বলা হয়েছে (লিঙ্গ অর্থাৎ শিব)।

পুরাণে মহেশ্বরের স্থান অতি উচ্চে এবং তাঁর মহিমা অনন্ত ও অচিন্তনীয়। শিবপুরাণে বর্ণিত আছে, 'অ'-'ক্ষ' পর্যন্ত সকল বর্ণ সমূহের মধ্যে তিনি বিরাজমান অর্থাৎ তিনি শব্দময়। অ-কার তাঁর মস্তক, আ-কার তার ললাট, ই,ঈ-কার তাঁর দুই নেত্র, উ,ঊ-কার তাঁর দুই কর্ণ, ঋ-কার তাঁর দুই কপোল, ৯-কার তাঁর দুই নাসিকা, এ,ঐ-কার দুই ওষ্ঠ, ও,ঔ-কার দুই দন্ত পঙ্ক্তি, অনুস্বর এবং বিসর্গ দুই অনুদ্বয়। ক-বর্গের বর্ণগুলো হল তাঁর দক্ষিণ দিকের পাঁচটি হাত, চ-বর্গের পাঁচটি অক্ষর তাঁর বামদিকের পাঁচটি হাত। ট ও ত-বর্গে তাঁর পদদ্বয়। প-কারে তাঁর উদর, ফ-কারে ও ব-কারে দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব। ভ-কারে স্কন্ধ, ম-কারে হৃদয়। য-কার থেকে য়-কার পর্যন্ত ৭ টি অক্ষরে সপ্তধাতু, হ-কারে নাভি, ক্ষ-কারে নাদ। শিব শব্দের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, যিনি সর্বদা অনন্ত আনন্দ শক্তির উৎস, তিনিই হলেন শিব। এই শিব শব্দের উৎপত্তি হল 'শৃইব' অর্থাৎ শ-কার হল নিত্য সুখ ও আনন্দ, ই-কার হল পুরুষ এবং ব-কার হল অমৃত শক্তি। অর্থাৎ শিব হলেন অমৃত শক্তিশালী পুরুষ, আবার তিনিই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।

মহাভারতে শিবের দুই রূপের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। সৌম্যরূপে তিনি চন্দ্রশোভিত প্রসন্নবদন, মৃগচর্মের বস্ত্রাবৃত অভয় প্রদানকারী। কথিত আছে যে, রুদ্রের উগ্র-রূপের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন স্বয়ং অশ্বথামা। কারণ তিনিই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে এক গভীর রাতে পঞ্চপান্ডবদের হত্যার কু-মতলবে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন, রুদ্রের আশ্চর্য এক উগ্ররূপ দেখে। সেই অতি ভয়ানক বিরাটাকার দীপ্তি সমন্বিত পুরুষের পরিধানে ছিল রক্তাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম, কৃষ্ণজিন ও কণ্ঠে ছিল নাগ। তাঁর দেহাঙ্গকে অগ্নিমুখ সর্প বেষ্টন করে আছে। কারণ অশ্বথামা যে শিবের উপাসক ছিলেন, তা মহাভারত থেকে আমরা জানতে পারি। অশ্বথামা শিবের বিগ্রহ তৈরি করে তিনি সাকার প্রতিমায় শিব পূজা করতে এবং তাঁর পূজিত শিববিগ্রহ ছিল পঞ্চানন।

অন্যদিকে জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাব সম্পর্কে স্কন্ধপুরাণে ও লিঙ্গপুরাণে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ রয়েছে। স্কন্ধপুরাণে বর্ণিত একটি কাহিনি অনুসারে, ত্রিদেবের মধ্যে কে বড় তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং সেই সময় বিশাল সপ্তকোটি সূর্যের মতো এক জ্যোতিস্তম্ভের মধ্যে থেকে দৈববাণী হয় যে, ''যিনি এই জ্যোতিস্তম্ভের আদি ও অন্ত নির্ণয় করতে পারবে সে-ই একে অপরের থেকে বড় বলে প্রমাণিত হবে।'' এই কথা শুনে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দুজনেই স্ব-স্ব বাহনে চেপে একজন ঊর্ধ্বমুখে অন্যজন নিম্নমুখে ধাবিত হলেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হল এবং তাঁরা

লিঙ্গ আরাধনায় ব্রতী হলেন। তাঁদের এই অসীম তপস্যার পর, সেই জ্যোতির মধ্যে থেকে আবির্ভূত হলেন সোমশুভ্র মহাদেব। বিষ্ণু ও ব্রহ্মা বুঝলেন বৃথাই তাঁরা নিজেদের মধ্যে, 'কে বড়?' তার অহংকারে মত্ত ছিলেন। আসলে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন, দেবাদিদেব মহাদেব। তারপর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রার্থনা করে বললেন, ''হে মহাদেব! আপনার এই লিঙ্গ রূপকে স্থিত করুন। আপনি স্থিত হলে, যুগ যুগান্তর আপনার ভক্তরা সকলে পূজা করতে পারবে।'' তখনই ওই আকাশব্যাপী লিঙ্গ স্বরূপের সম্মক প্রকাশ করে স্থাবর লিঙ্গ হন এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর দ্বারা পূজিত হন। সেই থেকে লিঙ্গ পূজার সূচনা হল।

অপরদিকে পুরাণে শিব নামের প্রতিভু, কারণ একদিকে শিব মঙ্গল ও ধ্বংসের প্রতীক। যজুর্বেদে রয়েছে, যে সত্যনিষ্ঠাকে জ্ঞান দান করেন ও পাপীদেরকে দুঃখ ভোগের মধ্যে শাস্তি দেন। তিনিই রুদ্র। এই ভয়ঙ্কর মূর্তি দ্বারা তাঁর আরেকটি প্রসন্ন শান্ত সমন্বিত রূপ হয়েছে। যেখানে তিনি শরণাগতকে স্মরণ দেন ও তাঁর সকল অভীষ্ট কামনা পূরণ করেন, মঙ্গলময় শিব রূপে। বেদ উপনিষদে রুদ্রই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছেন। কখনো তিনি প্রতিপালক হয়ে বিশ্বভুবনকে সৃষ্টি ও পালন করেছেন, আবার সংহারও করেছেন। তিনি সর্বজীবের মধ্যে চৈতন্যরূপে বিরাজিত। তাঁর অসীম শক্তি দ্বারা জীবের সকল ইন্দ্রিয় পরিচালিত হয়। যিনি সর্বদেবতার উৎপত্তি করেছেন, সকল ক্ষমতার উৎস, যিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই রুদ্র। অদ্বিতীয় এই রুদ্রকেই ঋষিরা বলেছেন, ''ক্ষরং প্রধন্যং অমৃতং অক্ষরং হর—দেব একঃ।'' অর্থাৎ জগৎরূপ প্রকৃতি ক্ষয়শীল, কিন্তু পরম দেবতা হর অমর, কারণ তিনিই প্রকৃতি বা জগতের নিয়ন্ত্রণকর্তা। ঋষিগণ আরো বলেছেন, ''মায়াং প্রকৃতিং বিদ্যাং মায়িং তু মহেশ্বরং'' অর্থাৎ পরমা প্রকৃতিই হল মায়া শক্তি এবং পরম পুরুষ মহেশ্বর হলেন এই মায়ার পরিচালক বা নিয়ন্ত্রক। অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সুতরাং শিব ও শক্তি অভিন্ন। শক্তি ভিন্ন শিব-শব, আবার শিব ছাড়া শক্তির অস্তিত্ব নেই। এঁরা হলেন একে অপরের পরিপূরক।

শিবের ধ্যানমন্ত্রে আছে পঞ্চব্রতং ত্রিনেত্রং। ত্রৈত্তিরীয় আগম-এ শিবের পাঁচটি নামের উল্লেখ করেছে। এই নামগুলো হল—**১) সদ্যোজাত :** নির্মাণতন্ত্রে বর্ণিত রয়েছে মুখটি শুদ্ধ স্ফটিকের মত শুক্লবর্ণ যা পশ্চিমমুখী।

২) বামদেব : এটি পীত বর্ণের সৌম্য, মনোহর ও উত্তরমুখী।

৩) অঘোর : কৃষ্ণবর্ণ, ভয়ংকর ও দক্ষিণমুখী।

৪) তৎপুরুষ : রক্তবর্ণ দিব্য ও মনোরম। এটি পূর্বমুখী।

৫) ঈশান : শ্যামংণ সর্বদেব স্বরূপ শিব, যিনি ঊর্ধ্বমুখী।

কথিত আছে যে, শিবের এই পঞ্চমুখ থেকেই ২৮টি আগম বা তন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে। আগমতন্ত্রে বলা হয়েছে, যে ত্রিপুট যন্ত্রের ষট্ কোণে শিব পূজা বিহিত।

শিব সকল জীবের প্রভু, তাই তিনি—ঈশান : (খট্টাঙ্গ, পাশাসৃনি, কপাল হস্ত চতুর্ভুজ, রক্তবর্ণ বেদামনা), তিনি ষড়ৈশ্বর্যশালী তাই তিনি ভগবান। তিনি দেবগন বন্দিত, তাই তিনি মহাদেব। পশু বা জীবের কর্ম বন্ধন মোচন করেন বলে, শিব হয়েছেন পশুপতি। তাঁর জন্মদাতা কেউ নেই, তাই তিনি স্বয়ম্ভু। তিনি ধূম্ররুপ, তাই ধূর্জ্জটি। তিনি মঙ্গল বিধায়ক, তাই শিব। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, তাই তিনি মহাকাল। তিনি সনাতন ও পুরুষ তাই স্থানু। তাঁর হাতে ত্রিশূল, তাই তিনি ত্রিশূলপানি। বিশ্বের সমস্ত গ্লানি, পাপ তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেছেন, তাই তিনি নীলকণ্ঠ, সর্ব ভূতের মুক্তি বিধান করেছেন, তাই তিনি শংকর। শংকর শব্দের অর্থ হল শম করেতি ইতি শংকর অর্থাৎ যিনি তাঁর ভক্তদের সমস্ত সংশয় দূর করেন এবং যিনি জগৎ থেকে অন্যায়, অত্যাচার, পাপ, ব্যভিচার দূর করেন এবং অশুভত্বের বিনাশ করেন এবং জগত সংসারের শান্তি, কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা প্রদান করেন, তিনিই শংকর অর্থাৎ শিব।

ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে মহা শিবরাত্রির দিনেই বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ প্রকাশিত হয়েছিল। এই কারণে সারাদেশে মহা ধূমধামের সঙ্গে পালন করা হয় মহাশিবরাত্রি, যা হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যে শৈব ভক্তের এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দিনের বেলায় পালিত বেশিরভাগ হিন্দু উৎসবের বিপরীতে মহাশিবরাত্রি রাত্রে পালিত হয়। মহাশিবরাত্রি হল একটি বিশেষ অনুষ্ঠান, বিবিধ উপাচারে যা চার প্রহর পালিত হয়। অগণিত ভক্ত এই দিন উপবাস থেকে শিবলিঙ্গে ঘৃত, মধু, গঙ্গাজল, ফুল দিয়ে পূজা করে থাকে। শৈব ভক্তদের ধারণা, শিব ভক্তের সকল অভীষ্ট কামনা পূরণ করেন। ■

প্রকৃত জীবনশৈলী : ভগবান মহাবীরের উপদেশ

আদিত্য দেব

ভগবান মহাবীর এমন একটি যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যখন সম্পূর্ণ সমাজ জাতি-বর্ণ, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ ইত্যাদি ভেদাভেদে বিভক্ত ছিল। ব্যক্তির পরিচয় তাঁর চরিত্র ও শ্লীলতার উপর নির্ভরশীল ছিল না বরং আভিজাত্যের মাপকাঠি অর্থাৎ ধন-সম্পদ, সোনা-চাঁদি, দাস-দাসী ইত্যাদির উপর ছিল। ফলে তখন দাসপ্রথার প্রচলন পূর্ণরূপে ছিল। এই ধরনের সামাজিক বিষমতার মধ্যে কুন্দনপুরের রাজা সিদ্ধার্থ এবং মহারানী ত্রিশলার গৃহে চৈত্র শুক্ল ত্রয়োদশীর মধ্যরাত্রিতে একটি তেজস্বী বালকের জন্ম হয়। এই বালকের গর্ভধারণের পর থেকেই রাজার সুখ, সম্পত্তি বৃদ্ধি হচ্ছিল দেখে জন্মের পর এই বালকের নাম রাখা হয় বর্ধমান। এই বালকের জন্মের খবর দেয় দাসী প্রিয়ংবদা, তাই রাজা তাকে উপহার স্বরূপ দাসত্ব মুক্ত করে দেন। অর্থাৎ জন্ম লগ্নেই বর্ধমান দাসত্ব প্রথা থেকে মুক্তি দেন সেই দাসীকে। জৈন ধর্ম অনুসারে ওঁদের কোন তীর্থঙ্কর অতি মানব অবতার রূপে জন্ম নেননি, বরং সামান্য ব্যক্তির মতনই জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয় রাজ পরিবারে জন্ম নেওয়া সত্ত্বেও বর্ধমান-এর মনে শাহী বৈভবের প্রতি কোন আকর্ষণ জন্মায়নি। জন্ম থেকেই তিনি অতীন্দ্রিয় জ্ঞানী ছিলেন। নিজের জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি প্রাণী মাত্রেই চৈতন্যের ধারা প্রবাহিত হতে দেখতে পারতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন সুখ-দুঃখের প্রাণী স্বয়ংই সৃজক এবং ভাগ্য তার হস্তাক্ষর। কোন নিরপরাধ কিংবা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া মানবিকতার নজরে অপরাধ।

মাত্র ৩০ বছর বয়সেই তিনি সাধনার দুষ্কর পথে অগ্রসর হন। ১২ বছর ধরে শারীরিক সুখকে ভুলিয়ে ধ্যানের সমুদ্রে সমাহিত হন এবং সত্য ও জ্ঞানের সূর্যকে সাক্ষাৎ করেন। বৈশাখ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শী হয়ে মহাবীর নামে পরিচিত হন। ভগবান মহাবীর সামাজিক এবং ব্যক্তিক্রান্তির শিখরপুরুষ ছিলেন। মহাবীরের দর্শন কেবলমাত্র অহিংসা এবং সমতার দর্শনই ছিল না। বরং ক্রান্তির দর্শন ছিল। ওঁনার ক্রান্তি অর্থ হচ্ছে জাগৃতি, ক্রান্তি অর্থাৎ স্বচ্ছ বিচারের ক্রান্তি, সত্য ও পূর্ণতার পথে অগ্রসর হবার ক্রান্তি। বাস্তবে মহাপুরুষরা যে পথকে সত্যের পথ ভাবেন, সেই পথে অগ্রসর হওয়ার সময় বিভিন্ন বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করাই ক্রান্তি। ভগবান মহাবীর এই অর্থে ক্রান্তিকারী বিচারক ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য কোন গৃহবাসীকে সন্ন্যাসের পথে ঠেলা ছিল না, তিনি ব্যক্তির রুচি ও ক্ষমতা অনুসারে সাধনার পথ দেখাতেন। তিনি মানব মাত্রেই হিংসা, অসত্য, চুরি অব্রহ্মচর্য এবং পরিগ্রহ থেকে মুক্ত থাকার উপদেশ দিতেন। তিনি অসীমিত ভোগ এবং সংগ্রহ থেকে দূরে থাকতে বলতেন। মহাবীর স্বামী আকাঙ্ক্ষার সীমাকরণের কথা বলতেন। তিনি বলতেন, মূর্ছা পরিগ্রহ হয়, এমন চিন্তন করো। বাস্তবে আজকের সমস্যা হচ্ছে, পদার্থ এবং উপভোক্তার মধ্যে আবশ্যকতার এবং উপযোগিতার মধ্যে পার্থক্য বোঝার অভাব। উপভোক্তাবাদী সংস্কৃতি মহাত্বাকাঙ্ক্ষাকে বৃদ্ধি করে এবং মানুষ তার পেছনেই ছুটতে থাকে সংগ্রহ করো, ভোগ করো—এই নীতিকে চরিতার্থ করার জন্য। বাস্তবে এই চিন্তাধারাই আমাদের ভুল পথে নিয়ে যায়। জীবনের বাস্তব চিরন্তন সত্য এই যে, যৌবনের পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলো বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একই রকম থাকে না। অর্থাৎ ভোগ করার প্রবৃত্তি শরীরের সঙ্গে সঙ্গে স্থূল হয়ে যায়। ফলে আজকের সংগৃহীত ভোগ্যবস্তু সেই সময় আর ভোগের উপযোগী থাকে না।

ভগবান মহাবীর বলতেন, নিজের অন্তরমনে এমন কিছু আসতে দেবে না যা অন্তর মনকে প্রদূষিত করে। মনের মধ্যে শূন্য নির্মাণ করার দরকার, যা বাস্তবে সুখ, শান্তি ও সমাধির মার্গকে প্রশস্ত করবে। দিবা-রাত্রি, সংকল্প-বিকল্প, সুখ-দুঃখ, উল্লাস-বিষাদের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে এবং আগামীকাল কি হবে তার চিন্তায় ব্যস্ত থাকলে, সমাধিস্থ হওয়া সম্ভব না। সেইজন্য কারোর মধ্যে দোষ না দেখা, কারো সম্পর্কে কু-কথা না বলা এবং কু-কথা শোনা উচিত নয়। সন্তুলিত জীবন যাপন করার জন্য বর্তমানের মধ্যেই জীবনযাপন করার অভ্যাস জরুরী। নৈতিকতার পথে অহিংস জীবনশৈলীই বাস্তবে মহাবীর স্বামীর উপদেশ, যা মানব জীবনে স্থাপিত করলেই সমাজ জীবন সুস্থ ও সবল হবে। মহাবীর স্বামীর জন্মজয়ন্তী পালনের সময় ওঁনার আদর্শকেই জীবন যাপন করার সংকল্প হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। ■

হিন্দু নববর্ষ : বর্ষ-প্রতিপদ

ড. জয়ন্ত বিশ্বাস

সাধারণত প্রতি বছর ১লা জানুয়ারির দিনে আমরা হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে পরস্পরকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এটি খানিকটা ঠিক, কারণ আমরা সকলেই ইংরেজি ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু সনাতন হিন্দু কাল গণনা অনুসারে ভারতে নববর্ষ শুরু হয় চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদে, যাকে বলে বর্ষ-প্রতিপদ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হিন্দু ধর্মের সব রীতি-নীতি, পূজা-পার্বণ, যজ্ঞ-অনুষ্ঠান ইত্যাদি পঞ্জিকায় বর্ণিত তিথি অনুযায়ী পালন করা হয়। পুজো কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পুরোহিত দ্বারা সংকল্প পঞ্জিকা বর্ণিত দিন, বার, তিথি, মাস, ঋতু, স্থান আদির উল্লেখ করেই করানো হয়। কিন্তু তৎকালীন রূপে আমরা তা উচ্চারিত করে, প্রায়ই পরে ভুলে যাই। কিন্তু আমাদের কাল গণনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানতে পারলে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের জ্ঞান সম্পর্কে অভিভূত হয়ে যাব।

আমাদের মুনি-ঋষিরা গণিতশাস্ত্রের সম্যক জ্ঞান অর্জন করেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করতেন। উদাহরণস্বরূপ আর্যভট্ট, শ্রীধর, ব্রহ্মগুপ্ত, পদ্মনাভ এবং ভাস্করাচার্য প্রভৃতিরা গণিত শাস্ত্র চর্চা করে বীজগণিত, রাশি গণনা, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতির জটিল সমীকরণ সমাধান করেছিলেন। তাঁরা এই বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানকে প্রয়োগ করে চন্দ্র ও সূর্যের কৌণিক অবস্থান নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করেছিলেন এবং চন্দ্রাব্দ সূর্য সিদ্ধান্তের দ্বারা তিথি নির্ণয় করে দিনাঙ্ক, মাস গণনা করেন। চাঁদের কৌণিক অবস্থানের ৩০ ভাগের ১ ভাগ ধরে তিথি নির্ধারণ করেন। সূর্য ও চন্দ্রের ১২° কোণ হল একটি তিথি। একটি সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময় চাঁদের কৌণিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে দিন নির্ধারণ করে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি এই ৭টি নামকরণ করে একটি সপ্তাহ ধরা হয়।

বৈদিক ঋষিরা আবিষ্কার করেন, চন্দ্রের কোন নিজস্ব আলো নেই, চন্দ্র সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়। তাঁরা চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধির ফলে চন্দ্রের অন্ধকার অবস্থাকে অমাবস্যা ও উজ্জ্বল আলোকিত অবস্থাকে পূর্ণিমা নামে আখ্যায়িত করেন। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করে কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ নামে অভিহিত করেন। এক পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা এবং সেই অমাবস্যা থেকে পরবর্তী পূর্ণিমা পর্যন্ত ৩০ বার সূর্যোদয় লক্ষ করে ৩০ দিনের মাস নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু পরে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে জানতে পারেন, চন্দ্রমাস ৩০ নয়, ২৭/২৮ দিনের হয়। তাঁরা আরও লক্ষ করেন, একটি নক্ষত্র থেকে যাত্রা শুরু করার পরে সূর্য ৩৬৫ দিনে পুনরায় তার সঙ্গে মিলিত হয়, ফলে ৩৬৫ দিনের বছর নির্ধারণ করেন। আবার ১২টি চন্দ্রমাসে ৩৬৫ দিন হয় না। প্রতি তিন বছরে এক মাস কম হয়। চান্দ্র ও সৌর বছরের সামঞ্জস্য রাখার জন্য প্রতি তিন বছরে একটি মলমাস ধরা হয়, মলমাসে পুজো-পার্বণ কিংবা কোন শুভ অনুষ্ঠান হয় না।

অন্যদিকে ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুসারে আগে ১০ মাসের বছর গণনা হতো, বছর হতো ৩০৪ দিনের। ফলে সূর্যের বার্ষিক গতি ও ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে বছরের গণনার খুবই অমিল হয়ে থাকত। অবশেষে সম্রাট জুলিয়াস সিজার তাঁর নামে জুলাই মাস জুড়ে দেন। তারপর সম্রাট আগাস্টাস তাঁর নামে আগস্ট মাস ঢুকিয়ে দেন। এরপর থেকে বছর ১২ মাস এবং ৩৬৫ দিনের হয়। ভারতীয় কাল গণণাকে অনুসরণ করে সাত যাকে ল্যাটিনে সেপ্টেম বলা হয় তাকে সেপ্টেম্বর, আট যাকে ল্যাটিনে অক্টো বলা হয় তাকে অক্টোবর, নবম যাকে ল্যাটিনে নভেম বলা হয় তাকে নভেম্বর এবং দশম যাকে ল্যাটিনে ডিসেম বলা হয় তাকে ডিসেম্বর বলে ক্যালেন্ডারে জুড়ে দেওয়া হয়।

অনেক বিস্তারে না গেলেও সাধারণভাবে বোঝা যায় যে, আমাদের সনাতনী নববর্ষ যাকে বিক্রম সংবৎ বলা হয়, তা বর্তমানে ২০৮৩ যেখানে ইংরেজি বছর হচ্ছে ২০২৬, অর্থাৎ ৫৭ বছর পুরোনো কাল গণনা আমাদের। এই সাল পঞ্জিকা সম্রাট বিক্রমাদিত্য, শকদের পরাজিত করার বিজয় স্মারক হিসেবে শুরু করেছিলেন। আবার ৭৮ খ্রিস্টাব্দে সাতবাহন রাজা গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী শকদের পরাজিত করে শকসংবৎ (১৯৪৭) চালু করেন। কিন্তু যুগাব্দ গণনা অনুসারে বর্তমানে ৫১২৭ সাল চলছে।

পুরাণে বর্ণিত আছে চৈত্র মাসের প্রতিপদ তিথিতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেছিলেন। আবার শ্রীরামচন্দ্রের এই দিনেই রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। ঠিক একই দিনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হয়। শিখদের দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ দেবের এই দিনেই জন্ম হয়। এই শুভদিনেই স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সমাজ স্থাপনা করেন। এই দিনে সিন্ধু প্রদেশের বিখ্যাত সমাজ রক্ষক ভগবান ঝুলেলাল আবির্ভূত হন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (RSS) প্রতিষ্ঠাতা ডঃ কেশব বলীরাম রাও হেডগেওয়ার এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ইতিহাসের আধারে বলা যায়, বর্ষ-প্রতিপদ ভারতবর্ষের এক ক্রান্তিকারী দিন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পৃথিবী হেলে থাকার জন্য হিন্দু নববর্ষের সময়কালীন ২১ দিনের সময়কালে উত্তর গোলার্ধ অধিকাধিক সৌরশক্তি অর্জন করে। এটা ভারতবর্ষের জলবায়ু, প্রকৃতি এবং কৃষি চক্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। চারিদিকে নানারকম প্রস্ফুটিত ফুলে সেজে ওঠে প্রকৃতি। এই সেজে ওঠা প্রকৃতিকে বরণ করা হয় নানা আচার, অনুষ্ঠান, উপবাস, যাগ-যজ্ঞের আয়োজনের মাধ্যমে। নয় দিবসীয় চৈত্র নবরাত্রের মঙ্গল পর্ব শুরু হয় এই তিথি থেকে এবং শ্রদ্ধালুরা নয় দিন ধরে শক্তির দেবীর ভগবতীর পূজা অর্চনা করে গৃহে শান্তি সমৃদ্ধির কামনা করে থাকেন। বাস্তবে হিন্দু নববর্ষ কেবলমাত্র আনন্দের দিন বলে স্বাগত জানানো হয় না, বরং সংস্কৃতির নতুন উন্মেষের জাগরণ বলে পালন করা হয়। ■

শিবরাত্রি উৎসব, গোপালী আশ্রম, খড়্গপুর, দক্ষিণবঙ্গ

বজরঙ্গ দলের বর্গ, সুন্দরবন জেলা, দক্ষিণবঙ্গ

হিন্দু ধর্মের নিদর্শন : কম্বোডিয়া

ডাঃ মধুসূদন পাল

কম্বোডিয়ায় সূর্যোদয় হয় ভারতীয় সময়ের দেড় ঘণ্টা আগে। এটি এক সময়ে ছিল হিন্দুদেশ। তখন ভারতবর্ষের বণিকরা মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দো-চীনের বিভিন্ন অংশে বাণিজ্য বিস্তার করেছিল সমুদ্র পথে। বাণিজ্য সূত্রেই এসব অঞ্চলে ভারতীয়রা প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু মন্দির। পরবর্তীতে কিছু কিছু বৌদ্ধদের প্যাগোজ, মুসলিমদের মসজিদ তৈরি হলেও এখানকার আদিমতম সভ্যতা ভারতবর্ষের হিন্দু সভ্যতা।

অনেকের মতে, দক্ষিণ ভারতের এক রাজকুমার নৌবাহিনী নিয়ে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে কম্বোজ যায় বাণিজ্য সূত্রে। পরে সেখানকার এক রাজকুমারীকে বিয়ে করে খেমের সাম্রাজ্য তৈরি করে শাসন করতে থাকে। অর্থাৎ বণিকের মানদণ্ড রূপান্তরিত হয় রাজদণ্ডে। অবশ্য খেমের সাম্রাজ্য নিয়ে আরো একটি মত আছে।

খেমের সাম্রাজ্য (৮০২-১৪৩১ খ্রিঃ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি শক্তিশালী হিন্দু-বৌদ্ধ সাম্রাজ্য যা বর্তমানে কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, লাওস ও ভিয়েতনামের বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত। রাজ্য দ্বিতীয় জয়বর্ধন ৮০২ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে চক্রবর্তী ঘোষণা করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী আঘোর। এখানেই বিশ্বের বৃহত্তম মন্দিরগুচ্ছ আঙ্কোরভাটের অবস্থান। খেমের শাসকরা প্রথমে হিন্দুধর্ম এবং পরে ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক। আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং থাই রাজ্যের আক্রমণে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ১৪৩১ সালে। এদের বর্ণমালা ও ভাষার ভিত্তি মূলত সংস্কৃত ভাষা। বিরাট জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত আঙ্কোরভাটের এই মন্দিরগুচ্ছ। বিশাল জলপূর্ণ পরিখা দিয়ে এলাকা পরিবেষ্টিত। পরিখার পরেই প্রাচীর। প্রাথমিকভাবে আঙ্কোরভাট ছিল বিষ্ণুমন্দির। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হওয়ার পরে কম্বোজের রাষ্ট্রধর্ম হয় বৌদ্ধধর্ম। ধীরে ধীরে মন্দিরে বৌদ্ধধর্মের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয়, অনেক বুদ্ধ মূর্তি এবং বৌদ্ধ স্থাপত্য প্যাগোডা।

মন্দির এলাকায় প্রচুর তালগাছ। কম্বোডিয়ার জাতীয় ফুল পদ্ম আর জাতীয় গাছ তাল। কাঁচা-পাকা তাল এদের অন্যতম প্রিয় খাদ্য। এখানে বিশেষভাবে চোখে পড়ল আঙ্কোরভাট মন্দিরগুচ্ছের বাইরে হাজার দেড় হাজার বছরের পুরাতন অসংখ্য বড় বড় মন্দির। কালের প্রহারে এগুলি জীর্ণ। ভারত সরকার উদ্যোগী হয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে সাম্প্রতিককালে। কিছু কিছু দেবালয় মিশ্র সংস্কৃতির। অর্থাৎ সেখানে একইসঙ্গে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে শৈব-শাক্ত এমনকি বৈষ্ণবদের আরাধ্য দেবতা সেবা-পূজা পাচ্ছেন। এও দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ মন্দির-প্যাগোডা প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত হলেও সংস্কারের বা সংরক্ষণের বিষয়ে সরকারী ঔদাসীন্য। সিয়েম রিপ প্রদেশে অবস্থিত অনেক মন্দিরের চারপাশ জঙ্গলাকীর্ণ, জনবসতি খুবই কম। Prohm Temple-তে বহু গাছ দীর্ঘদিন ধরে বংশবিস্তার করে চলেছে পরম নিশ্চিন্তে। এক একটা গাছের উচ্চতা

১০-২০ তলা বাড়ির উচ্চতার সমান। আগেই বলেছি, আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, কিছু কিছু মূল্যবান প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণে কাজ করছে, যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

শীতকালে এখানে প্রচুর ফরাসী ও ভারতীয় পর্যটক আসে আঙ্কোরভাটের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য। এছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষও এখানে আসে আঙ্কোরভাটের অনুপম স্থাপত্য দেখে চোখ-মন সার্থক করতে। উল্লেখ্য, মন্দির বা মন্দির গুচ্ছ নির্মাণে কোনো লোহা ব্যবহার করা হয়নি। সবগুলোই পাথর দিয়ে তৈরি। গাঁথা হয়েছে চুন-সুরকি দিয়ে। অনুপম স্থাপত্যগুলো দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য খিলান বা আর্চের উপর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আঙ্কোরভাট মন্দিরগুচ্ছ।

মন্দিরগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে পর্যটকদের বিশ্বায় থৈ পায় না। যে কালো পাথরের স্ল্যাব দিয়ে মন্দির তৈরি, সেগুলোর এক একটির ওজন কমপক্ষে কয়েক টন। এখান থেকে প্রায় ১০০ কিমি উত্তরে একটি পাহাড় কেটে স্ল্যাবগুলো আনা হয়েছে। প্রশ্ন, কিসের সাহায্যে পাথরগুলো এতো নিখুঁতভাবে কাটা হল, কিভাবে এখানে আনা হল? যদি ধরেও নেওয়া যায়, পাহাড় কেটে হাতির সাহায্যে পাথরগুলো এখানে আনা হয়েছে, সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন, কিভাবে হাতিকে দিয়ে এখানে বহন করে আনা হয়েছিল? একটার উপর আর একটা স্ল্যাব কিভাবে তোলা হয়েছিল-এসব সমাধানহীন প্রশ্ন। যে প্রযুক্তির সাহায্যে এটা সম্ভব হয়েছিল, এখনও আমরা তার হদিশ করতে পারিনি। পিরামিড যেমন পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম, আঙ্কোরভাট মন্দিরগুচ্ছ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। স্থপতিদের কারিগরি জ্ঞান, জ্যামিতি সম্পর্কে নিখুঁত বোধ, সৌন্দর্যের অনুভূতি এ যুগের প্রযুক্তিবিদদের অবাক করে দেবে। মন্দিরে ঢোকার প্রবেশ পথের বিরাট দেওয়ালে রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনি অবলম্বনে আঁকা চিত্রমালা এককথায় অসাধারণ। একটি নদী সিয়েম শহর পর্যন্ত নেমে এসেছে ঐ পাহাড় থেকে। নদীর জল পানীয় ও চাষবাসের প্রধান উৎস।

একসময় এই অঞ্চলে ফরাসীদের অনুপ্রবেশ ঘটে। এখানে উপনিবেশ তৈরি করে তারা। আজকের লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামকে তখন বলা হত ইন্দো-চীন। সবটার উপরেই ছিল ফরাসী আধিপত্য। আঙ্কোরভাটের মন্দিরগুলোর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগুলো ছিল মহার্ঘ স্বর্ণখচিত। ফরাসীরা সেইসব অলংকার খুলে কিংবা গোটা মূর্তিটাকেই তুলে নিয়ে চলে গেছে নিজ দেশে। ইওরোপের বিভিন্ন মিউজিয়ামে সেগুলো প্রদর্শিত হচ্ছে। কম্বোডিয়া সরকার সেগুলো নিজ দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতীয়রা ওখানে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিকে হাতিয়ার করে। তাদের ক্ষমতার উৎস কখনোই বন্দুকের নল ছিল না। এখানেই অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতীয়দের পার্থক্য। একসময় থাইল্যান্ডের (পূর্ব নাম শ্যামদেশ) একটি দেশ ছিল সিয়েম রিপ প্রদেশ। 'সিয়েম' শব্দের অর্থ 'শ্যামদেশ' আর 'রিপ' শব্দের অর্থ 'সংগ্রহ'। অর্থাৎ শ্যামদেশ থেকে সিয়েম রিপ প্রদেশ সংগৃহীত। একমসয় শ্যামদেশও ছিল হিন্দুদেশ। শ্যামদেশের মতো কম্বোডিয়া সুস্বাদু ফলের দেশ। তালগাছ, আমগাছ পাশাপাশি সারিসারি দাঁড়িয়ে আছে কালের প্রহরী হয়ে। এখানকার প্রধান শস্য ধান এবং কাজুবাদাম। প্রধান খাদ্য ভাত।

এখানে আধুনিকতার নামে খোলামেলা পোষাক মেয়েরা পরে না। এদের পোষাক অনেকটা চীনা-জাপানী মেয়েদের মতো। রাস্তাঘাট-হোটেল খুব সুন্দর। রাস্তায় বড় বড় লাক্সারি বাসের প্রাধান্য। প্রচুর টোটো চলছে। মোটর সাইকেলের পিছনে ক্যারিয়ারে যাত্রী বহন করার দৃশ্যও পর্যটকদের চোখ টানবে। ভারতের বাজাজ কোম্পানির মোটর সাইকেল ওখানে প্রচুর। হোটেলে ধোয়ামোছার কাজে যুক্ত মূলত মেয়েরাই।

ভারতের মতো ওদের দেশেও পুতুল নাচের বিষয়টি রয়েছে। তবে এখানের পুতুল নাচের সঙ্গে ওদের বিস্তার ফারাক। ওদেশের পুতুল নাচ হয় জলে। বিষয় : কৃষক ও ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনের প্রেম-হাসি-কান্না। ওদেশের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে মূলত—ধান, কাজুবাদাম ও পর্যটন শিল্পের ওপর।

একময় কম্যুনিস্ট খেমেরুজ বাহিনী কম্বোডিয়ায় রাজনৈতিক শাসনের নামে ভয়ঙ্কর নরমেধ যজ্ঞ চালিয়েছিল। খুন হওয়া মানুষের মাথার খুলি দিয়ে সাজানো ওখানের একটি মিউজিয়াম। দেশের প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ খুন হয়ে যায় জল্লাদ খেমেরুজ বাহিনীর হাতে। সেখানে কম্যুনিস্টরা স্বর্গ নয়, তৈরি করেছিল নরক। গত তিন দশকে কম্বোডিয়া আবার পুনর্গঠনের পথে এগিয়ে চলেছে। সেখানে এখন পরম শান্তি। অধিকাংশ মানুষ বৌদ্ধ। মাত্র ১০ শতাংশ হিন্দু। কিন্তু সব বৌদ্ধ বাড়িতেই হিন্দু দেবদেবীরও পূজা হয়। অর্থাৎ এদের সমাজ ও ধর্মজীবনে বুদ্ধের পাশাপাশি হিন্দু দেবদেবীদের গভীর প্রভাব।

সিয়েম রিপ প্রদেশের আর একটি পরিচিত ও জনপ্রিয় জায়গা হল-মেকং ডেল্টা লেক বা ভাসমান গ্রাম। অবস্থান-সিয়েম রিপ শহর থেকে ১০ কিমি দক্ষিণে। মেকং নদী থেকে তৈরি হওয়া একটা বড় লেকের ওপর দেশি কাঠের তৈরি নৌকায় ভাসমান গ্রামের অবস্থান। একে বলা হয়—Great Lake of Combodia, এটি এশিয়ার বৃহত্তম মিষ্টি জলের লেক। মেকং নদীর জন্ম হিমালয় থেকে। তারপর তিব্বত, লাওস, বার্মা, শ্যামদেশ, থাইল্যাণ্ড ও কম্বোডিয়া হয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনাম। এখান থেকে দক্ষিণ

চীন সাগরের সঙ্গে মিলন। এটি একটি বিশাল নদী। মার্চ-জুলাই-এ জল শুকিয়ে যায়। তখন মানুষ নৌকা থেকে নেমে শুকনো লেকের উপর অস্থায়ী বাড়ি তৈরি করে। অন্য সময় কয়েক হাজার ছোট-বড় দেশি নৌকার উপর মানুষ ও কুকুর-বিড়াল বসবাস করে। কোন কোন বড় নৌকায় রয়েছে স্কুল, ক্রিশ্চানদের গীর্জা, বৌদ্ধদের প্যাগোডা, পুলিশ স্টেশন ইত্যাদি। এছাড়া অনেকগুলো নৌকাকে জুড়ে তার উপর বসেছে বড় বাজার। জোয়ারের সময় মেকং নদী থেকে জল ঢোকে ও পরে কমে যায়। তখন সেইসব জায়গায় পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানো যায়। এখানের অধিকাংশ মানুষ মৎস্যজীবী। অনেকে ভিয়েতনাম থেকে আগত উদ্বাস্তু। মাছেদের মধ্যে প্রধান চিংড়ি। এখানের অর্থনীতির মূল ভিত চিংড়ি মাছ রপ্তানি।

কম্বোডিয়ার মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ। অর্থাৎ অখণ্ড মেদিনীপুর জেলার লোকসংখ্যার থেকেও কম। যুদ্ধ বিধ্বস্ত কম্বোডিয়া যেভাবে আর্থিক উন্নতি করেছে তা খুবই প্রশংসনীয়। এসব দেখে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে খুব মর্মাহত হতে হয়। কারণ, আমরা কিছুই পারিনি বরং অতলে তলিয়ে যাচ্ছি। শুধু আঙ্কোর অঞ্চল ও ভাসমান গ্রামকে কেন্দ্র করে যেভাবে পর্যটন শিল্প এবং পরিকাঠামো তৈরি করেছে সরকার, তাতেই তাদের উন্নতি নিশ্চিত হয়েছে। বারবার মনে হয়েছে, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহারকে নিয়ে উত্তরবঙ্গে একটি, মধ্যবঙ্গে মালদহ, মুর্শিদাবাদ নিয়ে আর একটি, অন্যদিকে রাঢ়বাংলার বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর, বীরসিংহ, কামারপুকুর, জয়রামবাটি, রাধানগর আর সমুদ্রোকুলবর্তী সুন্দরবন নিয়ে ৪ খানা পর্যটন শিল্প আমরাও গড়ে তুলতে পারতাম। সবগুলোরই প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। কম্বোডিয়া যেভাবে রক্তক্ষয়ী জীবন-যাপন করেছে—সেরকম অবস্থা তো পশ্চিমবঙ্গে কখনোই ছিল না। তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে এই ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় কেন? পশ্চিমবঙ্গবাসীর অনুভূতি কবে তৈরি হবে? সবদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের অধোগতি কেন? বিশেষত, মানবসম্পদের অপচয় চোখে দেখা যায় না। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা-স্বাস্থ্য, শিল্প, রাস্তাঘাট, আইন-শৃঙ্খলা সবদিকেই প্রতিবেশী রাজ্য আসাম, উড়িষ্যা, বিহার যা উন্নতি করেছে, যেভাবে কম্বোডিয়া এগিয়ে চলেছে—সেসব দেখে আমাদের চোখ-মন কবে খুলবে? ■

ফুলেশ্বর দুর্গাবাড়ির শিবরাত্রি, দক্ষিণবঙ্গ

গোপালী আশ্রমে শিবরাত্রি, খড়্গাপুর, দক্ষিণবঙ্গ

বার বার রাম নবমীর মিছিলে হামলা হয় কেন?

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসবে হিংসা সারাদেশে নিয়মিত ঘটনা। গত বছরও হাওড়ায় রাম নবমী মিছিলে পাথর ছোঁড়া সহ হামলা হয়েছিল, যার ফলে বহু ভক্ত আহত হয়েছিল। হামলার কারণে মিছিল ত্যাগ করতে হয় অংশগ্রহণকারীদের।

আসল বিষয় হল : রাম নবমীর মিছিলে নিয়মিত হামলা কেন হয় তা বোঝা। এর কারণ হল ভগবান রাম হিন্দুদের অন্যতম জনপ্রিয় দেবতা এবং আধুনিক হিন্দু প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে উঠেছেন, তিনি পশ্চিমী অবক্ষয় ও মধ্য প্রাচ্যের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আধুনিক হিন্দু নবজাগরণের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতীক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। মিছিলে হামলার উদ্দেশ্য হল ভগবান রামের মূর্ত প্রতীককে দূর করা।

এই ধরনের আক্রমণ, গত কয়েক বছরে বিশেষ করে হিন্দু উৎসব, বিশেষ করে ভগবান রামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাম নবমীতে আরো বিশেষ করে যখন মিছিল মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যায় উদ্বেগজনকভাবে সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। রাম নবমী হিন্দু ক্যালেন্ডার বছরের অন্যতম প্রধান উৎসব ও একটি প্রধান শুভ উপলক্ষ। এই দিনে হিন্দুরা ভগবান রামের কাছ থেকে আশীর্বাদ চান, দুঃস্থদের খাদ্য বিতরণ করেন, আচার অনুষ্ঠান ও অন্যান্য জিনিস করেন যার মধ্যে শোভাযাত্রা আছে।

হামলাগুলো শুধু হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর নয়, তাদের প্রতিরোধকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও। ইসলামিক লুটেরা ও খ্রিস্টান ঔপনিবেশিকদের অধীনে বহু শতাব্দীর অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় ১৯ শতকে বেশ কয়েকজন ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও সংস্কারক হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত ও সংস্কার করার চেষ্টা করেছিলেন, যা থেকে আধুনিক হিন্দু পুনর্জাগরণ ধারণার জন্ম হয়। এইভাবে ভগবান রাম অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অসংখ্য সাংস্কৃতিক পার্থক্য দ্বারা প্রভাবিত বিভক্ত হিন্দু সমাজকে এক করার পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। তিনি হিন্দুদের অনুপ্রেরণার উৎস এবং ধার্মিকতা, সাহসিকতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য সম্মানিত ও আদর্শ মানুষের মূর্তি হিসাবে তাঁকে দেখা হয়। রাম নবমী উদ্‌যাপন ও রামায়ণ পাঠ, রাম যে মূল্যবোধ ও নীতির ধারক ছিলেন তা জীবিত রাখে। যেসব আধিপত্যবাদীরা সমগ্র পৃথিবীকে এক নেশন ও এক ধর্মীয় দলে পরিণত করতে চায় সেই আব্রাহামিকদের কাছে রাম অভিশাপ। তিনি হিন্দুদের নৈতিক পথনির্দেশক। তাঁর জন্মের উদ্‌যাপন রাম নবমী। স্বাভাবিকভাবেই তা এক স্বতন্ত্র হিন্দু পরিচয়কে দৃঢ় এবং শক্তিশালী করেছে, যে পরিচয় শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিম বিজয় ও খ্রিস্টান উপনিবেশবাদ সত্ত্বেও টিঁকে আছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বৃহত্তর হিন্দু জনসংখ্যাকে জাগিয়ে তুলতে রামের মূর্তি ব্যবহার করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করার লড়াইয়ে হিন্দুদের অনুপ্রাণিত ও ঐক্যবদ্ধ করার জন্য অনেক নেতা ভগবান রামকে আহ্বান জানান। এই লক্ষ্যে ভগবান রাম জাতীয় গর্ব ও প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠেন এবং ভারতীয় জনগণকে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগঠিত করতে সাহায্য করেন।

সামগ্রিকভাবে ভগবান রামের ব্যাপক আবেদন, মূল্যবোধ ও নীতিগুলো প্রচারিত হয়েছিল, এবং বিদেশি আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে হিন্দু স্থিতিস্থাপকতা গঠনে তাঁর স্থায়ী তাৎপর্য তাকে আধুনিক হিন্দু নবজাগরণের প্রতীকে পরিণত করেছিল যা খ্রিস্টান মিশনারি, ইসলামি অত্যাচারী এবং সেমিনারীদের কঠোরভাবে বিরোধিতা করেছিল, হিন্দু সমাজ সংস্কার করতে এবং দেশের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বয়নকে বজায় রাখতে চেয়েছিল।

রাম নবমীর মিছিলে ইসলামপন্থীদের আক্রমণকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত। ইসলামপন্থীদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল ভারতকে তার সহস্রাব্দ পুরানো ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং বর্তমান 'দার আল-হারব' (যুদ্ধের দেশ) থেকে 'দার আল-ইসলাম' (ইসলামের দেশ)-এ রূপান্তরিত করা 'গাজওয়া-ই-হিন্দ' সংস্থার মাধ্যমে। কিন্তু ভগবান রাম ও তাঁর সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ভারতকে ইসলামিক দেশে পরিণত করার প্রতিবন্ধক হয়েছে, তারা দেশের

সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মীয় ও নৈতিক বিবেককে সজীব করে চলেছে, যে কারণে রাম নবমী মিছিলগুলোকে অপমান করা হয়, তাদের কল্পিত চরমপন্থী হিন্দু ব্র্যান্ডরূপে দাগিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তাদের উপর হামলা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত হয়। এই কারণেই রাম নবমী মিছিলকে 'দানব' রূপে আঁকার চেষ্টায় বাম বাস্তুতন্ত্রের ইসলামপন্থী ও তাদের সহযোগীরা কুযুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে; মুসলমান মহল্লার মুসলমান আধিপত্যবাদীদের দোষ না দিয়ে তারা রাম নবমীর মিছিলগুলোকে হিংসার জন্য দায়ী করে। কারণ তারা 'মুসলিম এলাকা' বা মুসলিম ছিটমহল দিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে গিয়েছিল কেন?

রাম নবমীর মিছিলে আক্রমণ করে এই উৎসবের সঙ্গে হিংসা জুড়ে শেষমেষ একে পুরোপুরি বন্ধ না করা পর্যন্ত তারা এটা করবে। আমরা দীপাবলি উৎসবের সময়ে এই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম যখন 'উদারপন্থী' ও 'পরিবেশবাদীদের' দল এর বিরুদ্ধে অনুপ্রাণিত প্রচারণা চালায়, একে দূষণের সঙ্গে যুক্ত করে যদিও বৈজ্ঞানিকভাবে আতশবাজি ফাটানো পরিবেশে দূষণের একটি নগণ্য পরিমাণে অবদান রাখে।

আরও উদ্বেগের বিষয় 'জয় শ্রীরাম' শ্লোগানকে যুদ্ধের আর্তনাদ ও ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতীক হিসাবে বিকৃত করার বামিস্লামিক প্রচেষ্টার সম্প্রসারিত রূপ হল রাম নবমীর মিছিলে হামলা। কয়েক মাস ধরে সোশ্যাল মিডিয়াতে ইসলামপন্থীরা ও তাদের সমর্থকরা 'জয় শ্রী রাম' শ্লোগানকে অপমান করছে, বিশেষ করে অল্ট নিউজের মোহাম্মদ জুবায়ের, যিনি মিথ্যা দাবি করেছিলেন যে গাজিয়াবাদে একজন বয়স্ক মুসলিম ব্যক্তিকে শ্লোগান দিতে অস্বীকার করার জন্য লাঞ্ছিত করা হয়েছিল। পরে এটা প্রকাশ্যে আসে যে ব্যক্তিগত শত্রুতা এবং জাদুবিদ্যাচর্চা ভুল হওয়ার কারণে হামলা ঘটেছিল। কিন্তু 'উদারপন্থীদের' সৈন্যরা 'জয় শ্রীরাম' শ্লোগানকে গালি দিতে এবং ভুয়ো খবর ছড়ানোর জন্য একটি অনলাইন তৈরি করেছে।

'জয় শ্রীরাম' শ্লোগানকে অপমান করার কারণ, হিন্দুদের শ্লোগানটি উচ্চারণ করা থামিয়ে তাদের সহস্রাব্দের পুরানো ঐতিহ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া।

কেন হিন্দুরা ধর্মীয় আধিপত্যবাদীদের কাছে জমি ছাড়বে না?

কিন্তু রাম নবমীর মিছিল বের করা, জয় শ্রীরামের মতো শ্লোগান দেওয়ার মতো অনুশীলনগুলো কয়েক শতাব্দীর ইসলামী নিপীড়ন ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ভারতীয়দের তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাম নবমী, দুর্গাপূজা, দশেরা, দীপাবলি এবং আরও অনেক কিছু উৎসব উদ্‌যাপনের মধ্যে হিন্দুরা তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বাদেশিকতা চেতনাকে সমাদর করে। বিদেশি শাসক ও অত্যাচারীরা ভারতকে এর ধর্মীয় চেতনা থেকে ছিনিয়ে নিতে না পারার একটা কারণ হল এর প্রথা ও ঐতিহ্য অনুসরণে এর জনগণের ধার্মিক নিষ্ঠা ও স্থিতিস্থাপকতা। ইসলামপন্থীরা যেহেতু দেশে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের চেষ্টা করছে, তাই সময় এসেছে হিন্দুদের তাদের ধর্মীয় অনুশীলনের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো এবং কঠোরভাবে পাহাড়া দেওয়া, তারা যেন সম্প্রসারণবাদীদের কাছে এক ইঞ্চি জমি না দেয়, এর সামাজিক-ধর্মীয় কাঠামো পরিবর্তন করতে না দেয়। ■

ধর্মপ্রসারের বিভাগ বৈঠক, বীরভূম, মধ্যবঙ্গ

মৃত বাবরের পুনরুত্থান : বাংলাদেশি উদ্বাস্তুর স্বপ্নভগ্ন

ওমপ্রকাশ ঘোষ রায়

২০২৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ প্রান্তে এসে হঠাৎ করে ধূমকেতুর মতো উদয় হল কবরগাহ ভেদ করে, ভারতবর্ষ তথা হিন্দুস্থানের এক কলঙ্কজনক কালিমা প্রাপ্ত অধ্যায়ের হোতা বর্বর বাবর। এই সম্রাট নামধারী বর্বর বাবর ছিল হিন্দু মন্দির ও দেব-দেবীর বিগ্রহ ধ্বংসকারী, হিন্দু হত্যাকারী, হিন্দু রমণী ধর্ষণকারী ও হিন্দুদের সম্পদ লুণ্ঠন কারীর মতো বহু ঘৃণিত জননিন্দিত দুষ্কর্মের হোতা। অতীতের মুসলমান হানাদারদের মতো যুগ যুগ ধরে সকল বহিরাগত যবন শাসকদের অনুগামীর কলঙ্কজনক কার্যকলাপ ভারতের ইতিহাসের পাতা কালিমালিপ্ত করেছে। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানেরা আমাদের দেশের প্রতিবেশী রাজ্য বিশেষ করে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে অবৈধভাবে এসে জবর দখল করতে চলেছে। আর তাদের আশ্রয়দাতা নগদ অর্থের বিনিময়ে জাল ও ভুয়া পরিচয় পত্র দিয়ে এই বাংলার সংখ্যালঘুদের তোষণকারী শাসকগোষ্ঠীর আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করে এই বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করে কয়েকটা মিনি পাকিস্তান তৈরির স্বপ্ন দেখছে। এইসব বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমান ও রোহিঙ্গারা এই বাংলার শাসক দলের ছত্রছায়ায় এসে ভোটব্যাঙ্কের অমানতদার তৈরি হচ্ছে। এমনিভাবে এই বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষকে গ্রাস করে তরুণ ইসলামে পরিণত করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। তাদের আশ্রদাতা জেহাদি গোষ্ঠী অতীতের মৃত মুসলমান শাসক ও সম্রাটের প্রেতাত্মা শাহজাহান, বাবর, হুমায়ুন, আকবর, ফরিদ, ঔরঙ্গজীব, জাহাঙ্গীর, আলম, আজম, খানজাহান, হাসান খালি, জালালউদ্দিন, নাসিরউদ্দিন, শেখ-শাহ-খান সুলতানরা উজ্জীবিত হয়ে সদর্পে সঘোষিত নেতার বেশে ইসলামী ঝান্ডা নিয়ে তরবারি ও কোরআনের বাণী আওরে উত্থিতি হয়েছে। এর জন্য একমাত্র দায়ী আজকের এই বাংলার নপুংসক তোষণকারী ভোটলোভী গদি প্রত্যাশী শাসক দল। যারা বলে থাকে, 'দুধেল গাইয়ের লাথি খাওয়াও শ্রেয়'। আর চটিচাটারা নিজেদের অতীত, ইতিহাস, স্বধর্ম, জাত্যাভিমান ভুলে গিয়ে নগণ্য ভাতার লোভে অকর্মার পর্যায়ভুক্ত এক ভেরুয়ায় পরিণত হয়েছে, যারা স্বাধীনতার মূল্যবোধ বোঝেনা। তারা এও বোঝে না যে, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ' এর মতন মহান বাণী, যা এক গর্বিত সর্বপ্রাচীন ধর্মপ্রাণ সনাতনী জাতি মহামানবের ডাক।

আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে যখন সারা বাংলা সহ দেশব্যাপী অনুপ্রবেশকারী জঙ্গি জেহাদি বিধর্মীদের বাছাইকরণ হতে চলেছে, অর্থাৎ এই ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সনাতন ধর্মীদের মধ্যে যারা অবৈধভাবে স্থান দখল করে ভারতের বৈধ নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা সমূহের অবৈধভাবে দাবীদার হতে চলেছে, তাদেরকে চিহ্নিত করে বিতরণ করার জন্য এস.আই.আর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারতের প্রকৃত নাগরিকদের ভোট দানের অধিকার অর্জনে বাছাই করা শুরু হয়েছে। ঠিক তখনই বাংলার সীমান্ত সংলগ্ন মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের ভারত বিদ্বেষীরা সম্রাট বাবরের নামকরণে একটি মসজিদ স্থাপনের জন্য জেহাদ ঘোষণার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্নবাদী জিহাদিরা মাথাচারা দিয়ে উঠেছে তাতে অংশগ্রহণ করেছে। বাংলার অনুপ্রবেশকারীরা, রোহিঙ্গারা, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের জেহাদী জঙ্গিরা, তাছাড়াও শাসকদলের অনুগামীরা তো রয়েছেই। শুধু অংশগ্রহণই নয়, তাদের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা অনুদানের পাহাড় গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি ইট, বালি, সিমেন্ট এবং রড ইত্যাদি তো রয়েছে। যদিও এর জন্য ভারত সরকার কিংবা হিন্দুরা কোন প্রকার উদ্বেগ প্রকাশ করেননি। একটি প্রার্থনা গৃহ যেকোন ধর্মপ্রাণ জাতি তৈরি করতেই পারে, কিন্তু শুধুমাত্র মসজিদটি 'বাবরি মসজিদ' অর্থাৎ বাবরের নামকরণ করাতে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন প্রতিবাদ জানিয়েছে। অথচ ইসলাম ধর্মানুসারে ইসলামের বিধি-বিধানে কোন মসজিদের নামকরণ ব্যক্তি বিশেষ নামে রাখা নাজায়েজ ব্যাপার, কেননা মসজিদ হল আল্লাহর ঘর, তাই তার নাম কোন ব্যক্তির নামে হতেই পারে না। অদ্যবধি শরীয়ত মতে কোন মসজিদের নামকরণ কোন ব্যক্তির নামে রাখা হয়েছে বলে জানা নেই। তাছাড়া মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় যে মসজিদ তৈরি হতে যাচ্ছে, তার সঙ্গে সম্রাট বাবরের কোন প্রকার যোগাযোগ রয়েছে বলে জানা নেই কিংবা অযোধ্যার এই সেই রাম মন্দির ধ্বংস করে নির্মিত অভিশপ্ত মসজিদটির কোন অপকীর্তির

সঙ্গে জড়িত কখনো ছিল না। এটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিন্দু জাতিকে উত্তপ্ত করার লক্ষ্যে একটি অপপ্রয়াস বলেই মনে হয়।

এই বাবর নামের সঙ্গে সকল ভারতীয়দের ভারতবাসীর পরিচয় আছে, এহেন নামধারী বর্বর সম্রাট বাবরের আত্মজীবনীতে দেখতে পাই, ফতেপুর সিক্রি আক্রমণের সম্পর্কে তার ভাষাতেই উল্লেখ রয়েছে, হিন্দু শত্রুদের পরাজিত করার পর তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে তাদেরকে পশ্চাদাবণ করে ব্যাপকহারে নিরীহ হিন্দুদের হত্যা করে থাকে। বাবরের শিবির হতে প্রায় ২ ক্রোশ দূরে ছিল দুর্গ প্রতিরোধকারী হিন্দুদের শিবির। বাবর তার সেনাপতি মোহাম্মাদিকে ও সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন হিন্দুদের কেটে দুখানা করে, যেন তারা পুনরায় একত্রিত হবার সুযোগ না পায়। কত যে হিন্দুকে সেদিন হত্যা করা হয়েছিল, তার কোন হিসাব ছিল না। এমনকি বাবর হুকুম দিয়েছিলেন নিকটবর্তী পাহাড়ের কাছে সমস্ত নর মুন্ডকে জড়ো করে একটি স্তম্ভ তৈরি করে একটি মিনার তৈরি করার জন্য। শুধু তাই নয় হিন্দুদের অসংখ্য মৃতদেহ পথে-ঘাটে এমনকি দূর দেশে আলোয়ার, মেওয়াট ও রায়না যাবার পথেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতেও দেখা গেছে। এমন ভাবে অমানুষিক হিন্দুদের হত্যাকাণ্ড ছাড়াও হিন্দুমন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করে সেই স্থানে মন্দির নির্মাণ করেছে। তবে সবথেকে মর্মান্তিক ও বর্বর কীর্তি হল বাবরের আদেশে তার সেনাপতি মীরবাঁকি অযোধ্যার শ্রীরাম জন্মভূমিতে রামলালার মন্দিরটি ভেঙে তাতে প্রায় এক লক্ষ হিন্দু রক্ত চুন-বালিতে মিশ্রিত করে ইট গেঁথে বাবরের নামে বাবরি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এছাড়া গোয়ালিয়রের নিকটে জৈন মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করেছে। বর্বর বাবরের এখানে পৈশাচিকভাবে হিন্দু হত্যা, বন্দী রমণী ও শিশুদের চামড়ার চাবুক দিয়ে মারা এবং তাদের সঙ্গে পশুর মতো ব্যবহার, এমনি আরো অনেক বর্বর ঘৃণ্য কাজকর্ম করেছে যা শিখ গুরুনানক স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে বাবর প্রথম শিয়ালকোট ও পরে সৈয়দপুর দখল করে এক ব্যাপক গণহত্যার আদেশ দিয়েছিলেন, যার ফলে হাজার হাজার হিন্দু প্রজাকে হত্যা করা হয়েছিল। আর এই নৃশংস কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে গুরু নায়ক স্বগতোক্তি করেছিলেন, "হে সৃষ্টিকর্তা ভগবান, জীবন্ত যম হিসাবে তুমি কি এই বাবরকে পাঠিয়েছ? অমানুষিকতার অত্যাচার, পৈশাচিক হত্যালীলা, অত্যাচারিতদের বুকফাটা আর্তনাদ ও করুণ ক্রন্দনকে তুমি শুনতে পাওনা? তাহলে তুমি কেমন দেবতা?" (সূত্র : R.C Majumdar, BVB Volume-VIII P. 307)

অনুরূপভাবে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা লগ্নে মুসলমানেরা পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে হিন্দু নরনারী হত্যাযজ্ঞ, হিন্দুনারী ধর্ষণ ও হিন্দুদের ধর্মান্তকরণ করেছিল তা বর্ণনাতীত। আবার ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার শাখারী পট্টিতে এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাক সেনারা রাজকার আলবদর আলসামসের সাহায্যে হিন্দুহত্যার যে জঘন্য কীর্তি সংঘটিত হয়েছিল চট্টগ্রাম কুমিল্লা, ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালী সহ সমগ্র বাংলাদেশে, আবার দেখি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা গ্রেট কিলিং-এর নায়ক সরোবার্দির নেতৃত্বে হিন্দুহত্যা যজ্ঞশালার ভয়াবহ চিত্র যার বিবরণ বাবরের নারকীয় ঘটনাকেও হার মানায়। কেননা ১৯৪৭-১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে কোন যুদ্ধ করেনি। বাংলাদেশী হিন্দুদের অপরাধ ছিল, তারা ভারতের অনুসারী। অথচ হিন্দুদের কোন নিজস্ব দেশ নেই। একমাত্র ভারতবর্ষকেই হিন্দুরা তাদের নিজেদের দেশ মনে করেন। কিন্তু এই ধর্মনিরপেক্ষ দেশটা কি তাদের ভাবতেই কষ্ট হয়। যাকগে ১৪২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই মার্চ বাবর ফতেপুর সক্রির অদূরে খানুয়ার প্রান্তের রানা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মুসলমানদের বিবরণ মতে সেদিন দেড় থেকে দুই লক্ষ হিন্দু নরনারী কাটা পড়েছিল এবং সেই কাটা মুণ্ডু দিয়ে বাবরের নির্দেশে পাহাড় তৈরি করা হয়েছিল। এমনই ছিল বর্বর বাবরের হিন্দু নিধন যজ্ঞ ও হিন্দু নিঃশেষ করার এবং হিন্দু মন্দির বিগ্রহ ভেঙে রদবদল করে অথবা ভাঙচুর করে মসজিদ তৈরি করা হয় যা যুগ যুগ ধরে এই ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণকারীদের অন্যতম কুকীর্তির কাহিনি, যা আজও মুসলমানরা ঘুর পথে অনুরূপভাবে সংগঠিত করে চলেছে এবং মসজিদের স্থাপন করে যাচ্ছে। আর হিন্দুদের মুসলমান হবার শরিয়াত দাওয়াত দিচ্ছে।

সুদূর অতীতে সকল বিদেশি মুসলমান আক্রমণকারীরা ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ বিন কাশিম থেকে শুরু করে আকবর, শাহজাহান, জাহাঙ্গীর, সুলতান মাহমুদ, ঘোরী, কুতুবউদ্দিন এবং আরো শত শত ভারতবর্ষ আক্রমণকারী মুসলমান শাসকবর্গ সবাই এসেছে এক হাতে কোরআন, আরেক হাতে তরবারি নিয়ে। শাসন করেছে হিন্দুদের,

মেরে কেটে ধনসম্পদ লুট করে নিয়ে, ধর্মান্তরিত করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছে। এরা সকলেই যা করেছেন, কোরাণিক আইন মেনেই করেছেন। সেই কোরআনেই দেখি (কো-২/৯৮) আল্লাহ কাফারদের (হিন্দু) শত্রু, আল্লাহ সাফ সাফ বলেছেন কাফেরদের (হিন্দু) সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না, যদি না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে না আসে, অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ না করে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়েও নেয় তবে তাদেরকে পাকড়াও করো এবং হত্যা কর, যেখানেই পাও। (কো-৪:১১৬/১১৭) যে আল্লাহর সঙ্গে অংশী স্থাপন করে, সে চরমভাবে গোমরাহ হয়। যারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে নারীর প্রতিমা পুজোকে আহ্বান করে, তারা শয়তানকে আহ্বান করে। (কো-৪১) তোমরা জান মান দিয়ে আল্লাহর জেহাদ কর। অতএব পবিত্র কোরআনকে মান্যতা দিয়ে মুসলমান শাসক সম্রাট থেকে শুরু করে সাধারণ মুসলমান ব্যক্তি বিশেষ কাফের অর্থাৎ হিন্দু পৌত্তলিকদের ধর্ম, সম্পদ ও নারীদের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ করবে, তা তো স্বাভাবিক। আর আজকে দেখতে পেলাম বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর বারংবার মুসলমানদের শানিত খর্গ নেমে এসেছে। তেমনিভাবেই ভারতবর্ষে কাশ্মীরের পেহেলগাঁও, মুর্শিদাবাদ, সন্দেশখালি, দেগঙ্গা তথা সকল মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে হিন্দুরা মুসলমান জিহাদিদের হাতে অত্যাচারিত ও প্রাণ হারিয়ে স্বদেশেই পরবাসী হয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের মা বোনেরা ইজ্জত হারিয়ে, ধর্মান্তরিত হয়েও রেহাই পায়নি।

অতি সম্প্রতি, ২০১০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত শহর লাগোয়া কার্তিকপুরে শনি-কালী মন্দিরের প্রতিমা ভেঙে তার উপর প্রস্রাব করে দেওয়া হয়েছে। কাকদ্বীপ ও গঙ্গাসাগরেও এমন ঘটনা ঘটিয়েছে জেহাদীরা। এ আর এমন কি? যখন ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে অত্যাচারী বর্বর নিষ্ঠুর রক্তপিপাসু মঙ্গোল-হুণ সেনাপতি তৈমুরলঙ ও চেঙ্গিস খাঁর বংশধর বাবর ভারতবর্ষ আক্রমণ করে দিল্লির সিংহাসন দখল করে, তখন তারই নির্দেশে ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে তার সেনাপতি মীরবাঁকি শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান অযোধ্যায় সরযূ নদীর তীরে রাম মন্দিরের চূড়া ভেঙে মসজিদের গম্বুজ তৈরি করে, মসজিদে পরিণত করে। বাবরি মসজিদ আদৌ মসজিদ ছিল কিনা? আর মীরবাঁকি তা তৈরি করেছে কিনা? এই প্রশ্নগুলো থেকেই যায়, কেননা এটি যদি মসজিদ হয় থাকে, তবে তার চারপাশে আজান দেওয়ার মিনার ছিল কি? মসজিদটির প্রাঙ্গণে মুসলিমদের অযু করার জন্য কোন জলাশয় বা জল রাখার ব্যবস্থা রয়েছে কি? সাধারণত মসজিদ তৈরি হয় পবিত্র কেবলামুখী হয়ে, এই বাবরি ধাঁচাটি কেবলামুখী ছিল নাকি, হিন্দু মন্দিরের মতো তৈরি ছিল? সর্বোপরি মীরবাঁকি যে মসজিদটি তৈরি করেছিল এমন কোন তথ্য বা নকশা বা বিবরণ কোন দলিলপত্র পাওয়া যায়নি। এর থেকে কি প্রমাণিত হয় না, যে এই ধাঁচাটি একটি মসজিদ নয়, এটি ছিল রামলালার জন্মস্থলে নির্মিত একটি হিন্দু মন্দির। তাছাড়া মীরবাঁকি রাম মন্দিরের নাম পরিবর্তন করে বাবরের নামে রাখে, বাবরি মসজিদ। উল্লেখ্য যে রাম মন্দির রক্ষাকল্পে বাঁকীর হাতে প্রায় দশ হাজার সাধু-সন্ত ও ধর্মপ্রাণ হিন্দু প্রাণ বিসর্জন দেন। সেই থেকে দিল্লিতে মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুরা ৭৭ বার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল, রাম মন্দির উদ্ধারের জন্য। আর এই সকল সংগ্রামে আরো প্রায় তিন লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ সাধু-সন্ত ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ আত্ম বলিদান দিয়েছিল।

অবশেষে ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনের অবসানে স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী সময়ে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর একদল ধর্মপ্রাণ হিন্দু নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মচেতনায় আত্মগ্লানির হাত থেকে মুক্তি পেতে রাম মন্দিরের এই ইসলামীকরণ গম্বুজ সহ ধাঁচাটি ভেঙে ফেলেন। তারই প্রেক্ষাপটে বিশ্বের সকল ইসলামী রাষ্ট্র, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে শুরু করে আরবিয়ান দেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের সীমাহীন মাত্রা কল্পনাতিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বাবরি ধাঁচা ভাঙার জন্য শুধুমাত্র বাংলাদেশেই প্রায় আড়াই হাজার হিন্দু মন্দির ভাঙ্গা ও হিন্দুরা নির্যাতিত হয়েছে। যদিও অযোধ্যার সেই বাবরি ধাঁচা ভাঙার স্থলে রামলালার মন্দির পুনঃনির্মাণের জন্য হিন্দু সাধু-সন্ত ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আদালতের দ্বারস্থ হয়। অনুরূপভাবে জেহাদী মুসলমানরাও বাবরি মসজিদ পুনঃনির্মাণের জন্য প্রার্থী হয়। দীর্ঘদিন আইনি লড়াইয়ে হিন্দুরা প্রাচীন ধর্মতত্ত্ব ইতিহাস ও দলিল পত্রাদির সপেক্ষে এবং আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার খননকার্যে প্রমাণিত হয়, যে ওই স্থানে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ বছর আগে তথাকথিত বাবরি মসজিদের স্থলে একটি হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল, যা রামলালার জন্মভূমিতে রামলালার মন্দির। অতঃপর ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১০-এ এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক ঐতিহাসিক রায়ে তথাকথিত বাবরি ধাঁচার

স্থানে শ্রীশ্রীরামলালার মূর্তি পুনরায় স্থাপনের ও পূজার জন্য আইনি স্বীকৃতি পেল। রামমন্দির স্থাপনের কাজ শুরু হল এবং এই মন্দির প্রতিষ্ঠার কান্ডারী হলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীজি, যাঁর অনুপ্রেরণা এই নবনির্মিত রামলালার অপূর্ব স্থাপত্য কীর্তি। এটি হল ভারতীয় সভ্যতার আধুনিকতম স্থাপত্যের নিদর্শন, এই ভারতবর্ষের এক বিরাট অবদান। গত ২২শে জানুয়ারি ২০২৪-এর পূণ্য তিথিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীজি রামলালার মন্দিরে ভারতে সকল হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নেতৃত্ববৃন্দ, সাংসদগণ, দেশি-বিদেশি বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ এবং সকল রাজনৈতিক নেতার উপস্থিতিতে রামলালার মূর্তি স্থাপন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং নিয়মিত পূজা করার ও ভারতীয় ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের রামলালার দর্শনের জন্য মন্দিরের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর এমনিভাবেই বহু যুগের এক কালো অধ্যায়ের পর্দা উন্মোচিত হয়ে, সনাতনী হিন্দুদের জয়যাত্রা শুরু হয়ে গেল। আর হিন্দুরাষ্ট্র ভারতের শুভ সূচনার বীজ বপন হল।

অপরদিকে আজকে এই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের প্রান্ত সীমানায় এসে মাথাচারা দিয়ে ওঠে মোগল, পাঠান, শক, হুন প্রভৃতি বর্বর মুসলমান শাসকদের রক্তবীজ, যারা আজকের এই স্বাধীন ভারতবর্ষে ৭৮ বছর ধরে আমাদের রক্ত শোষণ করে বেড়ে উঠেছিল। তাদেরই এক ছাড়পোকা হুমায়ুন নামধারী বাংলার শাসক গোষ্ঠীর পদলেহি তোষণকারী তথাকথিত বর্বর বাবরের নামে যে একটি বাবরি মসজিদ তৈরি করবার প্রয়াস নিয়েছে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায়, সেই ব্যক্তিই তো বাংলার শাসকদলের ছত্রছায়ায় ইতিপূর্বে বলেছিল, ‘এই মুর্শিদাবাদের মুসলমানরা ৬৫% আর হিন্দুরা হল ৩৫%। যেদিন মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে এই বাংলা দখল করে সিংহাসনে বসবে, সেদিন হিন্দুদের পরিণাম কি হবে? এখনই ইচ্ছে করলে ৩৫% হিন্দুকে কেটেকুটে টুকরো করে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দিতে পারি।’ এই ভারতে বেড়ে ওঠা এহেন মীরজাফরের দল আরও প্রচুর রয়েছে। যারা দিবা স্বপ্ন দেখছে, ভারতকে দখল করে ইসলামে পরিণত করার। অতএব এখনই প্রকৃত সময়, সনাতন হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকল রক্তবীজদের আর বাড়তে না দিয়ে উপড়ে ফেলতে হবে। তাছাড়া ঘরের শত্রু বিভীষণ যারা এদের মদদ দিচ্ছে তাদেরকে এবং অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী, পাকিস্তানিদের দমন করার একমাত্র উপায়। জয়তু শ্রীশ্রীরামলালার জয়। ভারত মাতাকি জয়।

পরিশেষে আমি একজন বাংলাদেশী উদ্বাস্তু এই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে সি.এ.এ-তে আবেদন করে দীর্ঘ ৪০ বছর পর নাগরিকত্ব পেয়ে নব ভারতের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলাম। কিন্তু আজ এই ২০২৫-এর প্রান্ত সীমানায় এসে বর্বর বাবরের মতো অতীতের মুসলমান বহিরাগত শাসকদের রেখে যাওয়া রক্তবীজদের বাড়বারন্ত উপলব্ধি করেছি। তবে কি আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে, আবারো উদ্বাস্তু হয়ে ভারতবর্ষ ছাড়তে হবে আমাদের? ■

শিবরাত্রির উৎসব পালন

গত ১৫ ও ১৬ই ফেব্রুয়ারি খড়গপুরে গোপালী আশ্রমে শিবরাত্রি উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। প্রথম দিন স্থানীয় ভক্তবৃন্দরা শিবের অভিষেক করতে আসেন এবং পরের দিন প্রায় ৫০০০ মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন। ১৫ তারিখ রাত্রে রুদ্রাভিষেক করা হয় রাত্রি ১১:০০ টা থেকে ২:৩০ পর্যন্ত। এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ সংগঠন মন্ত্রী শ্রীবিনায়ক রাও দেশপান্ডে, কেন্দ্রীয় সহ-সেবা প্রমুখ শ্রীআনন্দ প্রকাশ হরবোলা, প্রান্তের সহ-সভাপতি এবং মানব সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার ঝাঁওর, প্রান্ত সম্পাদক শ্রীচন্দ্রনাথ দাস, প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক শ্রীমানিকচন্দ্র পাল, প্রান্ত সহ-সেবা প্রমুখ শ্রীদিব্যেন্দু চক্রবর্তী এবং বিশ্বহিন্দু বার্তার সদস্য শ্রীশুভজিৎ দাস। এছাড়া মানব সেবা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীগিরিধারী লাল কেষান উপস্থিত ছিলেন। প্রান্ত ও জেলার সদস্যদের উপস্থিতিও ছিল সেখানে। খুব উৎসাহ সহকারে পূজন করা হয়।

শিবরাত্রি উদ্‌যাপন ও মন্দিরের উদ্‌ঘাটন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সেবা ট্রাস্ট মানব সেবা প্রতিষ্ঠানের ফুলেশ্বর দুর্গাবাড়ি প্রকল্পে, গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শিবমন্দিরের উদ্‌ঘাটন করা হয়, শিবরাত্রি তিথিতে। স্থানীয় জনসাধারণের বিপুল উৎসাহ দেখা যায় সেখানে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীঅজয় গোয়েল কার্যকর সভাপতি, শ্রীজয়দেব সাহা প্রান্ত সহ-সম্পাদক ও জেলার কার্যকর্তা বৃন্দ।

শিবরাত্রি পালন

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি রবিবার বিশ্বহিন্দু পরিষদের সেবা ট্রাস্ট মানবসেবা প্রতিষ্ঠানের ভগবানপুরে অবস্থিত শিশু মন্দির প্রাঙ্গণের শিব মন্দিরে মহা উৎসাহের সঙ্গে শিবরাত্রি পালন করা হয়। মানব সেবা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীগিরিধারী লাল কেষান এবং সম্পাদক তথা প্রান্তের সহ-সভাপতি শ্রীদিলীপকুমার ঝাঁওর সেখানে গিয়ে সকলকে উৎসাহ বর্ধন করেন।

বজরঙ্গ দলের প্রান্ত বৈঠক

গত ২৬ ও ২৭শে ফেব্রুয়ারি ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও বালিগঞ্জ কলকাতার প্রাঙ্গণে ২ দিন ব্যাপী বজরঙ্গ দলের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বৈঠক সম্পন্ন হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় সংযোজক শ্রীকিষান প্রজাপত, প্রান্ত সম্পাদক শ্রীচন্দ্রনাথ দাস, প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক শ্রীমানিকচন্দ্র পাল, প্রান্ত সংযোজক শংকর বোস মহাশয়, এছাড়া প্রান্তের বজরং দলের সদস্যবৃন্দ। শ্রীসঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজ সেখানে উপস্থিত থেকে সকলকে তাঁর আশীর্বাদ প্রদান করেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সেবা টোলির পরিকল্পনায় চক্ষু পরীক্ষা শিবির

শ্যামনগরে সোমনাথ মিত্র মানব কল্যাণ আশ্রমের প্রান্ত সমিতির সহ সভাপতির বাড়িতে মহাবীর ব্যানার্জিকে নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ১লা মার্চ চক্ষু চিকিৎসা শিবির ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী V'SUN ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এবং সুশ্রুত আই হসপিটাল সল্টলেক ও গীতা অপটিকালস-নৈহাটির সহযোগিতায় ১লা মার্চ ২০২৬, ২৪ পরগনা জেলা (উত্তর) শ্যামনগরের ব্যানার্জি পাড়ায় নির্মল রেখা এপার্টমেন্টে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা, ঔষধ প্রদান ও চশমা প্রদান শিবির আয়োজিত হয়। এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন সুভয় সাউ প্রান্ত সেবা মণ্ডলীর সদস্য। এখানে ৩০ জন পরিষেবা গ্রহণ করেন। পরে ভোজন এবং বিকাল ৪:৩০-৭:৩০ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং 'মাতৃ আরাধনা সংসদ' দ্বারা পরিবেশিত হয় মহিষাসুরমর্দিনী নাটক।

গৃহস্থদের জন্য ওঙ্কারনাথদেবের উপদেশ (মণিমালিকা)

১। ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যায় বসিয়া মস্তকে শ্রীগুরুদেবের,হৃদয়ে ইষ্টদেবতার ধ্যান করত মানসোপচারে পূজাপূর্বক যথাশক্তি জপ করিয়া পৃথিবীকে প্রণামান্তে শৌচাদি যাইবে।

২। যথাকালে উপাসনা করিবে। নিত্য ত্রিসন্ধ্যা করা ব্রাহ্মণ মাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য।
প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে প্রার্থনা ও জপধ্যান করিবে। অন্যবর্ণ জপ, ধ্যান ও প্রার্থনা করিবে।

৩। যাহারা চাকরী করে তাহারা প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নের জপাদি একেবারেই করিয়া লইবে।
কর্ম্মস্থানে যাইয়া কাজ করিবার পূর্বে 'শক্তি দাও' বলিয়া কার্য আরম্ভ করিবে, কার্য্যান্তে 'ফল নাও' বলিয়া প্রণাম করত গৃহে আসিয়া যথাসাধ্য জপধ্যান করিবে। প্রার্থনা করিবে।

৪। সাত্ত্বিক আহারই বাঞ্ছনীয়।
মাছ যাহারা ত্যাগ করিতে অসমর্থ তাহারা অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, একাদশী ও রবিবারে মাছ খাইবে না।
মাংসভোজী প্রসাদী মাংস ছাড়া খাইবে না—ত্যাগ করাই উত্তম।

৫। পরস্ত্রী হইতে দূরে থাকিবে।
ব্রহ্মচর্য শরীর ও সাধনার প্রাণ-ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

৬। সাধ্যমত সৎসঙ্গ করিবে, সর্ব্বদা নাম করিতে চেষ্টা করিবে।
নিয়মিত একাকী অথবা সঙ্গীগণসহ কিছুক্ষণ তারকব্রহ্ম নাম সংকীর্তন করিবে।

৭। অতিথি আসিলে সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক সাধ্যমত সেবা করিবে।
ভিক্ষুকগণকে ভিক্ষাদান করিবার সময় শ্রীভগবানকে দিতেছি এই ভাবটি মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে।

৮। পরিবারবর্গের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, রূঢ়ভাষী হইবে না, স্ত্রীকে দুর্ব্বাক্য বলিবে না বা প্রহার করিবে না।
মিষ্টবাক্য বলিবে—মিষ্টবাক্য বশীকরণ মন্ত্র -মিষ্টবাক্যের দ্বারা সকলকে বশীভূত করিতে পারা যায়।

৯। প্রত্যেক মানুষের কাম্য হইল শ্রীভগবানকে লাভ করা। যাহা কিছু আয়োজন তাহারই জন্য।
সর্ব্বদা নাম, সৎসঙ্গ, সৎগ্রন্থ, সংকীর্ত্তন—এইটি জীবনের সম্বল করিবে।
সংসার শ্রীভগবানের, আমি দাস—এই ভাবে সংসার করিবে।

১০। পিতামাতা জীবিত থাকিলে দেবতার ন্যায় তাঁহাদের সেবা করিবে।
পুষ্পাদির দ্বারা পূজা করিবে, চরণামৃত পান করিবে,তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে।
জয় গুরু, জয় জয় সীতারাম।

२१वीं शताब्दी का राजसूय यज्ञ

अरुण चूड़ीवाल

भगवान राम ने लंका पर सामरिक विजय के पश्चात राजसूय यज्ञ संपन्न किया था।

महाभारत युद्ध की आश्चर्यमय सफलता के उपरांत महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय का आयोजन किया था।

द्वापर युग तक राजा को चक्रवर्ती सम्राट उपाधि हेतु अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व स्वीकार करवाना पड़ता था; इस हेतु राजसूय यज्ञ आयोजित किए जाते थे।

राजसूय यज्ञ के अंतर्गत सम्राट ज्ञात एवं स्थापित राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सैन्य अभियान प्रेषित करते थे। सम्बन्धित राष्ट्र से अपेक्षा होती थी कि राजसूय यज्ञकर्ता की अधीनता स्वीकार कर आर्थिक कर प्रदान करें। यज्ञकर्ता, सम्बन्धित राष्ट्र पर, राजनीतिक पराधीनता आरोपित नहीं करता था।

सम्बन्धित राष्ट्र शांतिपूर्ण संबंध रखते हुए आर्थिक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध होते थे।

गत 1000 वर्षों के अरबी एवं तत्पश्चात् यूरोपिय काल में तानाशाही एवं औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था के प्रसारक राजसूय यज्ञ के उद्दात विश्व बन्धुत्व भाव की कल्पना भी नहीं कर सकते थे।

स्वतंत्र भारत के प्रथम 65 वर्ष, आर्थिक अव्यवस्था, खाद्यान्न अभाव, सैन्य शिथिलता अथवा सैन्य उपलब्धियों का राजनैतिक मंच पर समर्पण करना, आयात पर निर्भरता आदि राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक समस्याओं से ग्रस्त रहा।

2025 का मई, 100 वर्षों के वैश्विक युद्धों के इतिहास का अनुपम एवं अद्वितीय प्रसंग था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने लघुतम युद्ध में, शून्य जनहानि की शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त की। 88 घंटे का पूर्णतः निर्णायक युद्ध विश्व युद्ध इतिहास का नवीन कलेवर था। सन् 1965 एवं 1971 की तरह सैन्य विजय को राजनीति द्वारा पराजित भी नहीं किया गया।

मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर कलियुग का स्वतंत्र भारत के लिए लंका एवं कुरुक्षेत्र विजय सदृश्य था। इस युद्ध में पाकिस्तान (रावण) के साथ सुदूर पाताल स्थित महिरावण के गौरव प्रतीक भी नष्ट कर दिये गये।

2025 में भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर विभिन्न समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA करने की परंपरा प्रारंभ की। इस श्रृंखला में ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात् यूके, ओमनान स्विट्जरलैंड, आइसलैंड लीस्ट्रन, नॉर्वे, 27 देशों के यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक संबंध स्थापित किये गये। आधुनिक आर्थिक जगत में FTA वस्तुतः आर्थिक प्राथमिकता का स्वरूप है। जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया से यह संबंध 2025 के पूर्व स्थापित हो चुके थे। अंततः 2026 में अमेरिका का अहंकार को भी विनम्र होकर इस श्रृंखला की सदस्यता स्वीकार करनी पड़ी।

भौगोलिक दृष्टि से सिडनी एवं टोक्यो पूर्व से एवं सेन फ्रांसिस्को पश्चिम तक भारतीय अर्थ बंधुत्व के सदस्य बन गए हैं।

यह आर्थिक बंधुत्व ही 21वीं शताब्दी का राजसूय यज्ञ है।

16-20 फरवरी 2026 को दिल्ली में आयोजित वैश्विक **''सर्वजनहिताय/सर्वजनसुखाय'' एआई इंपैक्ट सम्मिट** इस राजसूय यज्ञ की एक अति महत्वपूर्ण आहुति है।

ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात् यह राजसूय यज्ञ का महाशुभारंभ हो गया है।

2047 में विकसित (सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र) भारत की पूर्णाहुति होगी। 2025 उसका श्रीगणेश/गोमुख है। ■

"কিছু চাইবেন না, বিনিময়ে কিছু আশা করবেন না। যা দিতে চাও, দাও! তিনি আপনার কাছে ফিরে আসবেন, কিন্তু এখনই তাকে নিয়ে ভাববেন না।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

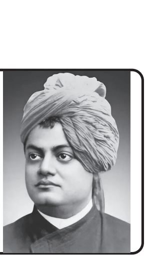

তপোবন আশ্রমে সন্ত সম্মেলন, ত্রিপুরা প্রান্ত

নেশামুক্তি অভিযানের জন্য কাবাডি প্রতিযোগিতা, ত্রিপুরা প্রান্ত

VISHVA HINDU VARTA
Phone : 2555-3589

15th March, 2026
Price : Rs. 15 only

RNI NO. : 30136

সৌজন্যে :

‘চর অচর অর্পণ ন্যাস’ (Char Achar Arpan Nyas)

Publisher : VISHVA HINDU PARISHAD, Dakshin Banga
33, Bhupen Bose Avenue, P.S.-Shyampukur, Kolkata-700004
Printed at Aditya Graphics & Printing, B/15/1/H/2, Balai Singha Lane, P.S.-Amherst Street, Kolkata-700009
E-mail : vishvahindu1964@gmail.com, vishvahinduvarta@yahoo.in